করোনা ও অর্থনীতি

করতে পারি, কিন্তু কেন করব?

শমীক সরকার

১

এরকম নয় যে করোনার আগে সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। অর্থনীতির বারোটা বেজে গেছিল নতুন করে। দেশের এবং বিশ্বের। বারবার বলা হচ্ছিল, মন্দা সমাসন্ন। চিটফান্ড ধ্বংস, নোটবন্দী এবং জিএসটি–র মাধ্যমে নিচুস্তরের পুঁজিকে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। করা হয়েছিল যাতে এই নিচুস্তরের পুঁজির উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবার বাজারটা উঁচুস্তরের পুঁজি বা কর্পোরেট পুঁজি ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু ফল হলো উল্টো। উঁচুস্তরের পুঁজির উৎপাদিত পণ্য এবং পরিষেবার বিক্রি গেল কমে। কারণ, নিচুস্তরের পুঁজিই হল উঁচুস্তরের পুঁজির উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবার মূল ক্রেতা। কর্পোরেট হাসপাতাল থেকে গাড়ি — সবাই মাছি তাড়াতে শুরু করল। উৎপাদন তলানিতে ঠেকল। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে ডিফল্ট করে কর্পোরেট মালিকরা পালাল বিদেশে। পুলওয়ামা না ঘটলে/ঘটালে বিজেপি হারত এই অর্থনীতির হাঁড়ির হালের জন্য। যদিও জিতেও বরে শাপ হয়েছে। বাজেটে ঘোষণা করল, নন–কর্পোরেট অর্থাৎ ব্যক্তি পুঁজিপতিদের ওপর সামান্য ট্যাক্স বাড়ানো হবে। ব্যস, ঝটাঝট ফরেন পোর্টফোলিও বা বিদেশি ব্যক্তিপুঁজিপতিরা পালিয়ে যেতে শুরু করল। ফলে সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত ট্যাক্স প্রত্যাহার করে নিল। সাফাই দিল, ওরা হল চাকুরিদাতা। একইসঙ্গে বেকারিত্ব–ও যে গত চার দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ হয়েছে, সেই রিপোর্টও এবার সামনে আনা হল। এবং অর্থনীতি রয়েই গেল বিশ বাঁও জলে। বিদেশ থেকে সিগন্যাল আসতে শুরু করল — ভারতের অর্থনীতি মন্দাক্রান্ত এবং সে শুধু নিজে মরবে না, সারা পৃথিবীকে মারবে, কারণ এই গ্লোবাল দুনিয়ায় মন্দাও লোকাল নয়। ঠিক এই সময় সিএএ–এনআরসি নিয়ে এসে অর্থনীতির দুরবস্থার আলোচনাকে পিছনে ঠেলে দিতে পারল বটে। কিন্তু আলোচনা দূরে ঠেললেই তো আর অবস্থা বদলে যায় না। অতএব অবস্থা রইল যে কে সে–ই, বরং বলা যেতে পারে, আরো খারাপ হল। এমতাবস্থায় এসে পড়ল করোনা।[১]

করোনার ফলে অর্থনীতি আর নতুন করে কী খারাপ হবে? কিন্তু হল। সুরাতের হীরে রপ্তানি কমে গেছিল আগেই, এবার পুরো বন্ধ হয়ে গেল, কারণ আন্তর্জাতিক হীরে বাজার বন্ধ। একইরকমভাবে মারুতির গাড়ি উৎপাদনও স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এই পর্যায়ের অর্থনীতির দশা আরো খারাপ হওয়া এই দেশের একার ব্যাপার নয়। সারা বিশ্বেই একই পরিস্থিতি তৈরি হল। স্বাস্থ্য ব্যবসা বাদে বাকি সমস্ত ব্যবসায় বাজার কমল। এমনকি স্বাস্থ্য ব্যবসাতেও লকডাউনের কারণে এখনি–না–করলেও–হয় এমন অপারেশন এবং দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে ক্লায়েন্ট কমে গেল।[২]

স্বাভাবিকভাবেই কীভাবে অর্থনীতির হাল ফেরানো যায়, তাই নিয়ে অর্থনীতিবিদরা বলতে শুরু করল এবং সরকার ব্যবস্থা নিতে শুরু করল। এবং, অবশ্যই, সরকারের কাছে দাবি জানাতে লাগল পুঁজিপতিরা। অর্থনীতি–বিদরা বলল, গরীবদের হাতে সরাসরি টাকা দাও। পুঁজিপতিরা বলল, আমাদের হাতে টাকা দাও। আমরা তবে শ্রমিকদের মাইনে দিতে পারব নইলে নয়। সরকার গরীব মহিলাদের অ্যাকাউন্টে পাঁচশ' টাকা করে দিল। আরও কিছু রেগুলার ভর্তুকি আগে দিয়ে দিল (কৃষকের অর্থসাহায্য)। রেশনে চালের পরিমাণ সামান্য বাড়ানো হল। পুঁজিপতিদের কিছু কিছু

---

[১]অর্থনৈতিক সঙ্কটের মার্ক্সীয় একটি ব্যাখ্যা হল 'লাভের হার–এর পতন'–এর তত্ত্ব। এই প্রসঙ্গটি ঘিরে দীর্ঘ বিতর্ক রয়েছে। আমরা আপাততঃ উঁচুস্তরের পুঁজির উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবার বিক্রি কমে যাওয়া–র আশু চিহ্ন এবং তার ক্রেতা নিচুস্তরের পুঁজির সাম্প্রতিক ধ্বংস–র মধ্যেই আলোচনাটি সীমাবদ্ধ রাখছি। বলাই বাহুল্য, এই সঙ্কট কতটা দীর্ঘ, কতটা গভীর — তা এখানে আলোচনা করা হবে না। তার আসল কারণ অনুসন্ধানও এখানে করা হবে না। পরে কখনও এটা নিয়ে আলোচনা করা হবে। উৎসাহীরা এই বিতর্কের পরিসরটি কত বড় তা আন্দাজ করার জন্য পড়তে পারেন এই বিষয়ে উইকিপিডিয়া এন্ট্রিটি। https://en.wikipedia.org/wiki/Tendency_of_the_rate_of_profit_to_fall#2009/2010_debate

[২]অর্থনীতির হাল বোঝার একটি সহজ উপায় বেকারত্বের হার দেখা। ভারতে ২০২০ র এপ্রিল ও মে মাসে বেকারত্ব ছিল প্রায় ২৩ শতাংশ, যা গত চার বছরের গড়ের তিনগুণ। https://unemploymentinindia.cmie.com/

করে টাকা দিতে শুরু করল, লোন হিসেবে ও ট্যাক্স ছাড় হিসেবে। কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল, সরকার গরীবদের হাতে টাকা দেবে না। বরং যে লাইনটা নিল — সেটা হল, সরকারি জায়গাগুলোতে যতটা সম্ভব বিদেশে উৎপাদিত জিনিস ব্যবহার কমানো। যদিও এই ব্যাপারটা আগে থেকেই চলত। উদাহরণ স্বরূপ, মিলিটারি ক্যান্টিনে বিদেশে উৎপাদিত জিনিস পাওয়া যেত না। এখন সিআইএসএফ এর ক্যান্টিনেও পাওয়া যাবে না। মিলিটারির অস্ত্রখাতে খরচ কিছুটা কমানো হল (২০ শতাংশ, কাগজে যা জানা গেল)। প্রতিটি মন্ত্রকের বাজেটের যে খরচ ধার্য করা হয়েছিল, তার থেকে ব্যায়সংকোচ ঘোষণা করা হল (২০ শতাংশ)। একটা ভাবনা বেরিয়ে এল সরকারের সিদ্ধান্তগুলো থেকে — যে ভাবনা বেশিরভাগটাই পুঁজিপতিদের মস্তিষ্ক প্রসূত; অর্থনীতিবিদদের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়; ভাবনাটা হল — কম শ্রমিক দিয়ে বেশিক্ষণ খাটিয়ে ইচ্ছামতো খাটিয়ে বেশি উৎপাদন করা। এবং সেই সস্তার মাল বিদেশে রপ্তানি করা। কারণ করোনা পরিস্থিতিতে নতুন নতুন পণ্যের চাহিদা তৈরি হয়েছে। যেমন পিপিই। যেমন মাস্ক। ইত্যাদি। এছাড়া যদি সম্ভব হয়, তাহলে চিন ইত্যাদি জায়গায় যে কর্পোরেট কোম্পানিগুলির ম্যানুফ্যাকচারিং বেস রয়েছে, সেগুলি ভারতে টেনে আনা শ্রমআইন তুলে দিয়ে, ফ্রি–তে জমি এবং প্রয়োজনে ট্যাক্স ছাড় দিয়ে। কর্পোরেটরা এখন তাদের উৎপাদনী খরচ আরো কমাতে চাইবে। এই সুযোগটা নিতে হবে। এতে নতুন কর্মসংস্থান হবে।

যে প্রশ্নদুটোর উত্তর এল না, এক, চিন ছেড়ে ভারতে ম্যানুফ্যাকচারিং বেস বানাতে যাবে কেন গ্লোবাল কর্পোরেটরা? এতদিন পারেনি, এখন করোনার ফলে কী এমন পরিস্থিতি এল যে চিনের তুলনায় ভারত তাদের উৎপাদনী ক্ষেত্র হয়ে উঠবে? চিন থেকে যেহেতু করোনা সংক্রমণ শুরু হয়েছে, সেই কারণে চিনের ওপর একটা সন্দেহ কাজ করছে। কিন্তু চিনে তুলনামূলকভাবে সস্তার শ্রমিক পাওয়া যায়, তাই নয়। চিনে দক্ষ শ্রমিকও পাওয়া যায়। দুই নম্বর প্রশ্ন, হঠাৎ বাইরের লোকে ইন্ডিয়াতে তৈরি হওয়া মাল কিনতে যাবে কেন? ফিনিশ মালের এক্সপোর্টার হিসেবে ইন্ডিয়া কী কী রপ্তানি করে? হীরে, মোটরগাড়ি ও মোটরসাইকেল, শোধিত পেট্রোল, মেশিন, কেমিক্যাল, স্টিল, কাপড়জামা …। কিন্তু এগুলোর মধ্যে হীরে ছাড়া বাকি আর কোনো কিছুতেই ইন্ডিয়া রপ্তানিতে উঁচুর দিকে নেই। তাছাড়া, ভারত দক্ষিণ এশিয়ার নানা ট্রেড কার্টেল যেগুলো আছে, সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই ট্রেড কার্টেলের মধ্যে চিন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সিঙাপুর, ভিয়েতনাম ইত্যাদি নানা রাষ্ট্র আছে। এই ট্রেড কার্টেলগুলির মধ্যে বোঝাপড়া কাজ করে। ভারত সেগুলোতে ইচ্ছে করেই

যায়নি, কারণ তাতে ভারতের যত না রপ্তানি শুল্কে ছাড় মিলবে, তার থেকে অনেক বেশি আমদানি শুল্কে ছাড় দিতে হবে। ভারত যত রপ্তানি করে, তার থেকে অনেক অনেক বেশি আমদানি করে। এবং এই আমদানির বেশিরভাগই চিন থেকে।

যাই হোক। তবে এটাই সব নয়। রপ্তানি–নির্ভর তো বটেই, তবে রপ্তানি শুধু নয়। আরেকটা ধারনাও সম্ভবতঃ ভেতরে কাজ করছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত। চিট ফান্ড ধ্বংস, নোটবন্দী এবং জিএসটি–র মধ্যে দিয়ে যে নিচুস্তরের পুঁজি ধ্বংস করা হয়েছিল, সেই পুঁজিটাকে যদি ফের তৈরি হতে দেওয়া যায়। রাজ্যে রাজ্যে বারো ঘন্টা শ্রমসময় চালু করে দেওয়া, ফ্রি–তে জমি, ট্যাক্স ছাড়, সহজ শর্তে ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে লিকুইডিটি বা ক্যাশ সরবরাহ এবং নিয়মকানুনে ছাড়ের মাধ্যমে। 'ভোকাল এবাউট লোকাল' — এর মধ্যে এই বাসনা রয়েছে সম্ভবতঃ। কারণ, চিন থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং বেস ভারতে চলে এলেও সেই ম্যানুফ্যাকচারিং নিশ্চয়ই কর্পোরেটেরা সরাসরি করবে না, তারা সেগুলো তুলনায় ছোটো সংস্থাগুলোকে সাবকন্ট্রাক্ট দিয়ে দেবে। যেমন আমাদের এখানে নানা এসই–জেড, ইপিজেড, 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট' বা আইটি পার্কগুলোতে কাজ হয়।[৩]

২

এসব তো ভবিষ্যতের ব্যাপার, কিন্তু বর্তমানে অর্থনীতির খুব খারাপ অবস্থা। অর্থনীতির খুব খারাপ অবস্থা — এইটুকু বলে ছেড়ে দিলে পাপ হবে। চারিদিকে প্রচুর বেকার, 'আনলক'–এও বেকারত্ব খুব যে কমছে তা নয়। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রায় চারকোটি মানুষ

[৩] কেন্দ্রীয় সরকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে করোনা–প্যাকেজটি বানিয়েছে, তা এই নিচুস্তরের পুঁজির দিকে লক্ষ্য রেখে। প্রথমতঃ, ক্ষুদ্র ছোটো ও মাঝারি শিল্পের আওতায় এনে ফেলা হয়েছে অনেক বড়ো সংস্থাগুলিকে, বিনিয়োগের ঊর্ধসীমা দুই থেকে চারগুণ বাড়ানো হয়েছে। একইসাথে নতুন একটা ঊর্ধসীমা যোগ করা হয়েছে, সেটা হল আয়ের পরিমাণ। অর্থাৎ, বৃদ্ধির একটি সীমার মধ্যে আছে তুলনায় যে বড়ো সংস্থাগুলি, সেগুলিকেও এই ক্ষুদ্র ছোটো মাঝারি–র আওতায় আনা হয়েছে এবং তাদের জন্য ক্যাশ বা লিকুইডিটি ঋণের মাধ্যমে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে প্যাকেজে, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে, এবং সেই ঋণের শর্তও সহজ করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী পাঁচ বছরে শোধযোগ্য ঋণ, প্রথম বছরের সুদ ফেরত দেবার প্রয়োজন নেই, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, এই ঋণ ও সুদের একশ' শতাংশ গ্যারান্টার সরকার, অর্থাৎ সংস্থা ফেরত দিতে না পারলে সরকার দেবে। এই ঋণের পরিমাণ ৩ লক্ষ কোটি টাকার মতো, যা বাজেটের দশ ভাগের এক ভাগেরও বেশি। https://www.business-standard.com/article/economy-policy/corona-package-msme-definition-changed-loans-worth-rs.-3-lakh-cr-announced.html

পরিযায়ী শ্রমিক। বেশিরভাগই গ্রামবাসী। তাদের বেকারত্ব এবং ঘরে ফেরার জন্য দুর্দশা আমরা নিজেদের চোখেই দেখেছি। এছাড়াও আছে শহরাঞ্চলের হকাররা। আছে কম পয়সার প্রচুর কর্মী, যাদের চাকরি গেছে। কেউ ডেলিভারি বয়, কেউ ক্যুরিয়ারের লোক, কেউ সংবাদপত্র বিক্রেতা, কেউ দোকান কর্মচারী। এছাড়া ছোটো কারবার যাদের, তাদেরও রোজগার শূণ্য হয়েছে। কেউ কেউ সব্জি নিয়ে বসে গেছে রাস্তায়। কিন্তু অনেকেই পারেনি। 'অর্থনীতির খারাপ অবস্থা' — এই অফিশিয়াল কথার বা কোডওয়ার্ডের ভেতরের অর্থটা হল — মানুষের জীবন যাপনের অবস্থা খারাপ।

যদি নিচুস্তরের পুঁজিকে পুনর্গঠনের সুযোগ দেওয়াই লক্ষ্য হয় সরকারের, তবে সেটাও সম্ভবতঃ পুঁজিপতিদের ফর্মুলা মেনেই হচ্ছে, অর্থনীতিবিদদের দাওয়াই মেনে নয়। এটা পুঁজিবাদের একটা চিরন্তন সমস্যা, যে, ব্যক্তি পুঁজিপতি নিজের বা নিজেদের স্বার্থের বাইরে ভাবতে পারে না, এবং তার মধ্যে দিয়ে গোটা পুঁজিবাদ-কে সমস্যায় ফেলে বারবার, যখন পুঁজিপতির আপাত স্বার্থ পুঁজির দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।[৪] সেই জন্যই প্রয়োজন হয় বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের, যারা কোনো পুঁজিপতির স্বার্থ দেখে না, পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থ দেখে। এই যে বারো ঘন্টা শ্রমদিবসের ব্যাপারটা — এটা সরকার করতে চলেছে, কারণ, সরকার অর্থনীতিবিদদের কথায় চলছে না, চলছে প্রভাবশালী পুঁজিপতিদের কথায়। এতে ভারতীয় পুঁজিবাদের ক্ষতি — কারণ, শ্রমদিবস দীর্ঘায়িত হলে বেকার বাড়বে এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাবে, বাজারে মন্দা বাড়বে। কিন্তু এই দূরদৃষ্টি প্রভাবশালী পুঁজিপতিদের নেই। এই জন্যই রাজন, বিনায়ক ইত্যাদিরা বলছে, লোককে টাকা ছাপিয়ে দেবার জন্য। অর্থাৎ, পরিভাষায় অ্যাডভান্স ডেফিসিট স্পেন্ডিং, বা যত জিডিপি দাঁড়াবে, তার চেয়ে বেশি টাকা বাজারে ছাড়ার জন্য। এতে লোকের হাতে পয়সা যাবে। জিনিসপত্রের দাম বাড়বে একথা ঠিক। কিন্তু সেটা কিছুদিনের মধ্যে সামলে নেওয়া যাবে, লোকের কেনার পরিমাণ বাড়ার মধ্যে দিয়ে। মুশকিল হবে অন্য জায়গায়। ডেফিসিট স্পেন্ডিং-এর ফলে ভারতের ঋণগ্রহীতা হিসেবে রেটিং

[৪] এই যেমন, করোনা অতিমারী লকডাউন হবার ঠিক আগের কয়েকদিন ধরে ভারতে কর্পোরেটদের ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশ দেবার উৎসব চলেছে। লভ্যাংশের ওপর ট্যাক্স বাড়বে এপ্রিলে, সরকারের এই ঘোষণার ফলশ্রুতিতে বহু কোম্পানি অগ্রিম লভ্যাংশ দিয়ে দিয়েছে। শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন দিতে সমস্যা হলেও ডিভিডেন্ডে বা লভ্যাংশ দিতে এতটুকুও লজ্জা পায়নি কোনো কর্পোরেট। তবে বিদেশে এই পারিশ্রমিক না দিতে পারলেও লভ্যাংশ দেওয়া নিয়ে কথা উঠেছে। ডিজনি কোম্পানির বিরুদ্ধে। এই লিঙ্কে বিস্তারিত জানা যাবে। https://www.facebook.com/EquityManifesto/photos/a.114677449919000/254712249248852/

কমে যাবে। অর্থাৎ, বিদেশি অর্থসংস্থাগুলি এই দেশে ঋণ দিয়ে সেই ঋণ ফেরত পাবে কি না এই অনিশ্চয়তা বাড়বে। ফলতঃ ঋণ দেওয়া কমবে। উল্লেখ্য, আমাদের দেশে সরকারের হাতে দু-ভাবে উপরি টাকা আসে। এক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারকে যদি টাকা দেয়। বা বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভ বেচে দেওয়া। যেসব সচরাচর হয় না। দুই, বিদেশি অর্থসংস্থার কাছ থেকে কিছু শর্তাধীন ঋণ নেওয়া।[৫]

যাই হোক। অর্থনীতি হল জীবন। অর্থনীতি মানে জীবিকা ভাবা হয়, আসলে তা জীবিকা নয়, জীবন। এই যে একটা দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে, করোনা বনাম অর্থনীতি, অর্থাৎ, জীবন বনাম জীবিকা — এই কথাটা ঠিক না। অর্থনীতিও আসলে জীবন। অর্থনীতি বলার মাধ্যমে তাকে সংকীর্ণ করা হয়। তাই অর্থনৈতিক সমস্যা হল জীবন যাপনের সমস্যা। অর্থনৈতিক সঙ্কট মানে হল জীবনযাপনের সঙ্কট। জীবনযাপনের পুঁজিবাদী ভাষান্তর হল অর্থনীতি।

যেমন ধরা যাক, রিয়েল এস্টেট — এটা একটা অফিসিয়াল বা অর্থনৈতিক নামকরণ। জীবন যাপনে এটাকে বলে ঘরবাড়ি। বা বাড়ি ঘর। রোটি কাপড়া মকান – এর মকান। লোকগানেও আছে, 'লোকে বলে, বলে রে ঘরবাড়ি ভালা না আমার'। এই ঘরবাড়ি সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত যেমন কর্পোরেটরা, পুঁজিপতিরা, প্রোমোটাররা, তেমনি ব্যাঙ্ক, তেমনি কোটি কোটি শ্রমিক যাদের একটা বড়ো অংশ পরিযায়ী, বহু স্বাধীন পেশাজীবী (ইন্টিরিয়র ডেকরেটর, দালাল)। এই রিয়েল এস্টেট সেক্টরকে চাঙ্গা রাখতে রিয়েল এস্টেট তৈরি করার সময়সীমা ছ' থেকে ন' মাস বাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। অর্থাৎ, এই ছ' থেকে ন' মাস একস্ট্রা ইএমআই গুনতে হবে যারা বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনবে তাদের। যেটা দাঁড়াচ্ছে, এরই

[৫] সারা পৃথিবীতে বড়ো দেশগুলি মধ্যে বেশিরভাগই অবশ্য সরাসরি গরীবদের এবং কর্মহারাদের অর্থসাহায্য দিয়েছে। অনেকে কোম্পানিগুলিকে গ্যারান্টিতে লোন দিয়েছে চাকুরিরতদের পয়সা দেওয়ার জন্য। অনেকে সরাসরি কর্মহীনদের পয়সা দিয়েছে। ইত্যাদি। কিছু কিছু রাষ্ট্র সার্বজনীন বুনিয়াদি আয় বা ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম স্কিমের দিকে গেছে। ফিসকাল প্যাকেজ ছাড়াও সরাসরি অর্থসাহায্যের প্যাকেজও বাস্তবায়িত হয়েছে। ভারতে সরাসরি গরীবদের হাতে পয়সা দেওয়া হয়নি। কিছু কিছু স্কিমে টাকা দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে, যেমন একশ' দিনের কাজ, গৃহনির্মাণ যোজনা, কৃষকদের জন্য যোজনা, বার্ধক্য ভাতা, গ্যাসের ভর্তুকি ইত্যাদি। কিন্তু নতুন কোনো অর্থ সাহায্যের স্কিম ঘোষণা করা হয়নি। অন্যান্য দেশের স্টিমুলাস প্যাকেজ, ফিসক্যাল প্যাকেজ এবং সরাসরি অর্থসাহায্যের স্কিম এই লিঙ্কগুলিতে জানা যাবে কিছু কিছু https://www.theweek.in/news/biz-tech/2020/05/18/covid-package-how-india-fares-against-other-major-economies.html
https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/cash-transfers-boe-covid19/

মধ্যে বিক্রি হয়ে যাওয়া, কিন্তু তৈরি না হওয়া, অর্থাৎ, আগাম ঘরবাড়ির দাম কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে রিয়েল এস্টেটকে বাঁচানো। অথচ, গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে ঘরবাড়ির দাম নিম্নমুখী, কারণ চাহিদাও নিম্নমুখী। প্রচুর প্রচুর ফ্ল্যাট ফাঁকা পড়ে আছে। বিক্রি হচ্ছে না।

আবার ধরা যাক, পর্যটন — এটাও অর্থনৈতিক নামকরণ। জীবন যাপনে এটাকে বলে বেড়ানো। এই শিল্পের অবস্থা এখন সবচেয়ে খারাপ বলতে গেলে। কোটি কোটি লোক বেকার। একেকটা রাজ্য বা জনপদ দাঁড়িয়ে আছে এই পর্যটনের ওপর, সেগুলোর কী অবস্থা। অনেকেই লোন নিয়ে কটেজ তৈরি করে ফেঁসে গেছে। এখানেও কর্পোরেটরা যেমন আছে, সাধারণ কটেজ মালিক আছে, তাদের কর্মচারীরা আছে, পোর্টার গাইড গাড়ি ড্রাইভার আছে। ছোটো ছোটো খাবার হোটেল রকমারি ফিরিওয়ালারা আছে। পুরী কোণারক দীঘা দার্জিলিং ম্যালে আমরা সবাই গেছি। একবার এটা ভাবলেই হবে, আমরা কেউই ওইসব এলাকায় গত দুই তিন মাস যাইনি। এবং আরো কতদিন যে যাব না তার কোনো ঠিক নেই। পুরো অর্থনীতিটাই বসে গেছে। এটাতে সম্ভবতঃ উপভোক্তার পকেট থেকে ভর্তুকি দেবার কোনো উপায় নেই।

কিন্তু এই অর্থনৈতিক নামকরণের মধ্যে কি কোনো অসুবিধার জায়গা আছে? আছে। সেটা হল, তা আমাদের জীবনযাপনকে, যা স্রোতের মতো, প্রবাহের মতো, তাকে কতগুলো খণ্ডে ভেঙে নেওয়া হয়। খণ্ডে ভেঙে নিলে কিছু সুবিধা হয়। কিসের সুবিধা হয়? ঘিরতে সুবিধা হয়। একটা সীমানা তৈরি করে তার মধ্যেকার একটা প্রণালী তৈরি করতে সুবিধা হয়। আন্তঃসীমায়িত বা দুটি সীমানার মধ্যে এবং অন্তঃসীমায়িত বা একটি সীমানার নিজেরই মধ্যে কিছু যন্ত্র এবং তাদের তন্ত্র তৈরি করতে সুবিধা হয়। এক একটা খণ্ডের মধ্যে চাপান উতোরও চলতে পারে। যেমন, রিয়েল এস্টেট না পর্যটন — কোনটা বেশি দরকারি মানুষের জীবনে? না বেড়ালেই কি চলে না? প্রয়োজন এবং অতিরিক্তের স্তরবিভাজন করা যায়। আবার উল্টোদিক থেকে, এক একটা ক্ষেত্রের সঙ্গে যারা যুক্ত — তারা চায় — সেই ক্ষেত্রে লোকে বেশি ব্যায় করুক। যত উন্নত হচ্ছে সবকিছু — তত, লোকে কোন ক্ষেত্রে বেশি ব্যায় করছে — তার সমীক্ষার ভিত্তিতে এই প্রয়োজন ও অতিরিক্তের স্তরবিভাজন করা হচ্ছে। যেমন, খাদ্য–বস্ত্র–বাসস্থান–পরিবহণ–শিক্ষা–স্বাস্থ্য — মোটামুটি এইগুলোতে লোকে অন্ততঃ / সবচেয়ে বেশি ব্যায় করে, অতএব এগুলোই মূল প্রয়োজনীয়। খানিক উসকানোও হচ্ছে নানা ক্ষেত্রে ব্যায় যাতে লোকে করে, তার জন্য, সাংস্কৃতিক নানা মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে। যেমন জিন্দেগী না মিলেগে

দোবারা–র মধ্যে দিয়ে ট্রেকিং জাতীয় পর্যটনকে জনপ্রিয় করা ইত্যাদি।

এইভাবে মানুষের জীবনপ্রবাহের খণ্ডীকরণের মধ্যে দিয়ে অর্থনীতি চেহারা পায়। সমাজকাঠামো ও ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিলে অর্থনীতি হয়ে যায় রাজনৈতিক অর্থনীতি কিন্তু তা অর্থনীতির মূল জায়গা থেকে সরে না।

৩

অর্থনীতির একটি মূল একক হল পণ্য। পণ্য বলতে আগে মূলতঃ দ্রব্যপণ্যই বোঝানো হত। তবে, আধুনিক অর্থনীতির একটা মূল জায়গা হল — পরিষেবা। দ্রব্যপণ্য উৎপাদনী ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়া এবং পরিষেবাপণ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়া, এটা চলছেই। মার্ক্স রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা শুরু করেছিলেন পণ্য থেকে। মার্ক্সের মতে, পণ্যই হল মূল — যার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে অর্থনীতির যোগাযোগ হয়। পণ্যের ব্যবহার মূল্য আছে, অর্থাৎ তা ব্যবহারযোগ্য হতে হবে; আর আছে বিনিময় মূল্য, অর্থাৎ তা বিনিময়যোগ্য হতে হবে। পণ্যের ব্যবহার মূল্য রাজনৈতিক অর্থনীতির আওতার বাইরে। বিনিময় মূল্য হল সেইটা, যা মূল বিচার্য। মুদ্রা হল বিনিময়ের মাধ্যম। একইসঙ্গে মুদ্রা হল পুঁজি বা মূলধন বা বিনিয়োগ। মূলধন দিয়ে কাঁচামাল যন্ত্রপাতি এবং আগাম শ্রমসময় (মার্ক্সের ভাষায় শ্রমক্ষমতা) বাজার থেকে খরিদ করে তা দিয়ে বানায় পণ্য, সেই পণ্য বাজারে চলাচলের মাধ্যমে বিক্রি হয় এবং বিক্রি হবার পর গোটা প্রক্রিয়াটা শেষ হয়ে গেলে প্রারম্ভিক পুঁজির বা বিনিয়োগের চেয়ে বেশি ঘরে আসে। এই বেশি ঘরে আসাটুকু হল লাভ। কিন্তু এই লাভটা হল কী করে? হল শ্রমসময়ের মূল্যে ঠকিয়ে। অর্থাৎ, শ্রমসময়ের মূল্য যা, তার চেয়ে আদতে কম মূল্য দিয়ে। কীভাবে এটা বোঝা গেল? একটা চিন্তাপরীক্ষা করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধরা যাক, গোটা প্রক্রিয়াটাতে লাভ নেই। কারণ লাভ করার কোনো দরকার নেই। তাহলে কী হবে? উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রি করে যা পাওয়া গেল, তা সমানভাবে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেওয়া হবে যারা তা উৎপাদন করল অর্থাৎ শ্রমসময় যারা দিল তাদের মধ্যে। ব্যস, তাহলেই হয়ে গেল। কিন্তু তা হয় না। শ্রমসময় একটা পণ্য নিজেই। মূলধন দিয়ে তাকে আগাম খরিদ করে পুঁজিপতি। এবং লাভটা নিজের ঘরে তোলে। আইডিয়ালি, লাভটা পুঁজির কলেবরে যোগ হয়। পুঁজির কলেবর বৃদ্ধি পায়। এবং আইডিয়ালি, পুঁজিপতির তার পুঁজির স্বার্থ ছাড়া আর কোনো স্বার্থ নেই। এই শ্রমসময়ের থেকে একাংশ মূল্য হাতিয়ে নিয়ে পুঁজির

কলেবর বৃদ্ধি — এটা হল মার্ক্সের ভাষায় উদবৃত্ত মূল্য।

এই উদবৃত্ত মূল্য বাড়ানোর চেষ্টায় থাকে পুঁজি। কারণ, তাহলেই বেশি লাভ তার কলেবরে যোগ হবে। পরমভাবে বা মোটমাটভাবে তাকে বাড়ানো যায় শ্রমসময়ের সময়টা বাড়িয়ে কিন্তু শ্রমসময়ের দাম না বাড়িয়ে অর্থাৎ ওই বাড়তি সময়ের জন্য বাড়তি মূল্য না দিয়ে। অর্থাৎ শ্রমসময় নামক পণ্যকে সস্তা করে। এখানে একটা প্রশ্ন আসবে, শ্রমসময়কে চাইলেই কি সস্তা করা যায়? চাইলেই না গেলেও, যায়। কারণ, প্রচুর বেকার থাকে। বেকারত্ব বাড়লে শ্রমসময় সস্তা করার সুযোগ বাড়ে। তবে এখানে শ্রমিক ইউনিয়নের ভূমিকা থাকে বিরোধিতার।

এছাড়া আরেক ভাবে উদবৃত্ত মূল্য বাড়ানো যায়। শ্রমদক্ষতা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে, যাকে বলে আপেক্ষিক উদবৃত্ত মূল্য (বৃদ্ধি)। শ্রমদক্ষতা বৃদ্ধি মানে হল, শ্রমসময় বাড়ানো হল না, কিন্তু একই শ্রমসময়ে উৎপাদন বাড়ল। এই শ্রমদক্ষতা বৃদ্ধি দু'ভাবে হতে পারে। এক, যন্ত্রপাতির নবীকরণের মধ্যে দিয়ে। দুই, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে। এই দুটি ক্ষেত্রেই শ্রমিক ইউনিয়নের সেরকম কোনো ভূমিকা থাকে না। যন্ত্রপাতির নবীকরণের মধ্যে দিয়ে যদি শ্রমিক ছাঁটাই না হয়, উৎপাদনের বৃদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তাহলে শ্রমিক ইউনিয়নের বিরোধিতার জায়গা থাকে না। সে বড় জোর বেতন বৃদ্ধি, অর্থাৎ, আপেক্ষিক উদবৃত্ত মূল্য যতটা কম বৃদ্ধিতে আটকে রাখা যায়, তার চেষ্টা করতে পারে। আর, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কোনো ভূমিকাই থাকে না। অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ইউনিয়নের ভূমিকা দেখা যায় সদর্থক। সে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, তার দাবি করে, কারণ, শ্রমদক্ষতা বাড়লে শ্রমিকের বেতনও বাড়তে পারে। তবে, এ তো নিশ্চিতই বোঝা যায়, শ্রমদক্ষতা যতটা আপেক্ষিক উদবৃত্ত মূল্যের বৃদ্ধি ঘটায়, শ্রমিকের বেতন তার তুলনায় অনেক কম বাড়ে।

এ তো গেল দ্রব্যপণ্য উৎপাদনের অর্থনীতি। পরিষেবার ক্ষেত্রে কী হয় দেখে নিয়ে ফের দ্রব্যপণ্যের অর্থনীতিতে আসা যাক। এখানে প্রথমেই বলে নেওয়া যাক, পরিষেবা বলে অর্থনীতির মহলে যে বিভাজনটা করা হয় দ্রব্যপণ্য উৎপাদনী ক্ষেত্র থেকে, তা দ্রব্যপণ্য উৎপাদনের চেয়ে মারাত্মক আলাদা কিছু নয়। যেমন, আইটি হল পরিষেবা। স্বাস্থ্য হল পরিষেবা। কিন্তু এগুলো নামেই পরিষেবা। আসলে দ্রব্যপণ্য উৎপাদন। শুধু যেটা অনুপস্থিত, সেটা হল, বাজারে চলাচলের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি নেই। পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রি 'একইসাথে'। অবশ্য একইসাথে হলেও, পেমেন্ট হয় দেরিতে। যেমন ধরা যাক, হাসপাতাল। স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হল।

রোগী সুস্থ হল বা মারা গেল। তারপর পেমেন্ট হল। অনেকটা ধারে জিনিস বেচার মতো। নিঃসন্দেহে চলাচল না থাকাটা পরিষেবা ক্ষেত্রকে বিক্রির একটা গ্যারান্টি দেয়। ফলে, অতিরিক্ত উৎপাদনের সমস্যা, যা পুঁজিবাদের দীর্ঘদিনের সমস্যা, ক্রনিক সমস্যা, তাকে অনেকটাই সুরাহা দেয় পরিষেবা ক্ষেত্র। অবশ্য এই অতিরিক্ত উৎপাদনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে যেটা করা হয়, আন্দাজ করার চেষ্টা করা হয়, মার্কেট সার্ভে, কতটা বিক্রি হতে পারে চলাচলের মাধ্যমে, সেটা বোঝার। বাজারে একচেটিয়ার দিকেও যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। পরিষেবার ক্ষেত্রেও এসব করা হয়, কারণ যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, শ্রমসময় আগেই খরিদ করে রাখতে হয়। হয়ত উৎপাদিত পণ্যের ইনভেন্টরি তৈরি হয় না, যেটা দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্যা। এবং কাঁচামালের খরচ হয় না অগ্রিম, যন্ত্রপাতির ব্যবহারের কারণে ক্ষয় হয় না অগ্রিম। এই অতিউৎপাদনের প্যাঁচ থেকে বেরোনোর জন্য পুঁজি চায়, ইচ্ছেমতো শ্রমসময় কিনবে বা কিনবে না। অর্থাৎ, শ্রমসময়কে কাঁচামালের মতো দেখতে চায়। তাই জন্য চায় ইচ্ছেমতো শ্রমিক নিয়োগ ও ছাঁটাই। কন্ট্রাকচুয়াল বা চুক্তিভিত্তিক শ্রমসময়। শ্রমসময় অগ্রিম কিনে রেখে দিতে চায় না ধারাবাহিকভাবে। ইদানিং তার অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়েছে।কিন্তু দক্ষ শ্রমের ক্ষেত্রে এটা করা মুশকিল (যদিও অসম্ভব নয়)। দক্ষ শ্রম বলতে, যে শ্রমে কিছু দক্ষতার চৌকাঠ আছে। সেই দক্ষতা না থাকলে সেই শ্রমটাই সম্ভব না। যেমন, ধরা যাক, নার্সিং–এর কাজ। বা ডাক্তারির কাজ। তিন–চার–পাঁচ বছরের কোর্স। আবার অনেক শ্রমে দক্ষতার চৌকাঠের কোনো ব্যাপার নেই। যেমন, ধরা যাক, মেঝে সাফাই–এর কাজ। শিখে নেওয়া যায় কাজে ঢুকেই। এই দক্ষ শ্রম এবং ওপরে উল্লিখিত শ্রমদক্ষতা কিন্তু একেবারেই আলাদা জিনিস। শ্রমদক্ষতা মানে হল, কাজে ঢুকে পড়ার পর শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা। যেমন ধরা যাক, একজন বায়োলজি টিচার হিসেবে স্কুলে ঢুকল। তারপর সে বিপিএড করে এল, ফলে সে এখন ফিজিক্যাল এডুকেশনের ক্লাসও নিতে পারে। ফলে আর আলাদা করে ফিজিক্যাল এডুকেশনের টিচার খরিদ করার দরকার পড়ল না স্কুল কর্তৃপক্ষের।[৬]

পরিষেবা ক্ষেত্র মানে শুধু এই পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে যে শ্রমসময়

---

[৬] ভারতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তিভিত্তিক কর্মীনিয়োগ কেবলমাত্র ম্যানুফ্যাকচারিং–এ ছিল ১৯৪৬ সালের আইন মোতাবেক। ঠিকাদারের অধীনে যদিও ঠিকা শ্রমিক প্রথা দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে সমস্ত ক্ষেত্রেই চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ বৈধতা পেয়েছে। https://labour.gov.in/sites/default/files/FTE\%20Final\%20Notification.pdf

অগ্রিম কেনা হচ্ছে (এবং অন্যান্য জিনিস) তা নয়। অর্থনীতির একেকটি ক্ষেত্রে স্বনিযুক্ত পরিষেবা প্রদানকারী থাকে প্রচুর। পেশাজীবী বলা যেতে পারে তাদের। এই পেশাজীবীরা সীমিতভাবে স্বাধীন। এবং সীমিতভাবে স্বনিযুক্ত। যেমন ধরা যাক, হাসপাতালের ফিজিওথেরাপিস্টরা। কম্পিউটার বা ফ্রিজের সার্ভিস প্রোভাইডার-রা। এমনকি উবের ওলা টাইপের পুল সার্ভিস যেগুলো কিছুটা। এই পেশাজীবী পরিষেবা প্রদানকারী থাকলে শ্রমসময় অগ্রিম কিনতে হয় না পুঁজিকে। কেবল যোগাযোগটুকুই যথেষ্ট। আপাতদৃষ্টিতে যেহেতু তাদের শ্রমসময় অগ্রিম কেনা হয় না, তাই বুঝি ভাবা হয়, ওই শ্রমসময়টা পুঁজি কিনছে না বা ওটার মধ্যে থেকে পুঁজির জন্য উদবৃত্ত মূল্য তৈরি হচ্ছে না। কিন্তু মোটেই তা নয়। উৎপাদনী পণ্য উৎপাদনে বা পরিষেবা পণ্য উৎপাদনে যেভাবে উদবৃত্ত মূল্য তৈরি হয়, সেভাবে হয়ত হচ্ছে না। কিন্তু উদবৃত্ত মূল্য তৈরি হচ্ছে। শুধু যে লাইসেন্স ফি বা কমিশন পাচ্ছে কোম্পানি — তা নয়। কীভাবে? যে হাসপাতালের এই সংযোজনী পরিষেবা আছে (ফিজিওথেরাপিস্ট, সাইকোথেরাপিস্ট, আকুপ্রেশারিস্ট ইত্যাদি) তার সামগ্রিক পরিষেবা-পণ্যটি, অর্থাৎ, চিকিৎসা — তার দাম বেশি। এই কারণেই নানা কর্পোরেট হাসপাতালের ফি স্ট্রাকচার নানারকম। একই কথা প্রযোজ্য কর্পোরেট স্কুলের ক্ষেত্রে। সেই বর্ধিত দামের মাধ্যমে যে বর্ধিত লাভটি হয়, সেই লাভের মধ্যে সংখ্যা পায় উদবৃত্ত মূল্যের মতো বিমূর্ত।

হ্যাঁ, উদবৃত্ত মূল্য সবসময়ই বিমূর্ত। এবং বিমূর্ত বলেই, তা শুধু লাভ নামক সংখ্যাগত কিছু নয়। আপেক্ষিক ও পরম উদবৃত্ত মূল্যের মাধ্যমে উদবৃত্ত মূল্যকে বুঝলে তাকে লাভ-এর সংখ্যাগত মূর্ততায় বা বেশ-এ নামিয়ে এনে বোঝা হয়। লাভ হল উদবৃত্ত মূল্যের বেশ। কিন্তু লাভ ছাড়াও উদবৃত্ত মূল্যের আবেশ আছে। উদবৃত্ত মূল্য বেশের থেকেও আরো কিছু, আবেশ। শুধু বেশ-এর মধ্যে সেটাকে সীমাবদ্ধ রাখা অর্থনৈতিক।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই আবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা ব্যবস্থাটির স্থিতি-তে ধরা যায় না। স্থিতি-তে শুধু বেশ বোঝা যায়। সংজ্ঞায় শুধু বেশ বোঝা যায়। ব্যবস্থাটির গতিশীলতায় ধরা পড়ে আবেশ। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাই অবশ্যই গতিশীল ব্যবস্থা। গতিশীল ব্যবস্থাও তো স্থিতির একটা রূপ হতে পারে। পারে না কি? যেমন, একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। নদী প্রবাহিত হচ্ছে। নদী তো আর থেমে থাকতে পারে না। সবসময় প্রবাহিত হয়। প্রবাহিত হয় বলেই সে নদী। নইলে সে হয়ত পুকুর হত। এই প্রবাহিত

নদী, বহতা নদী সে তো গতিশীল, এবং সে হল স্থিতির একটা রূপ মাত্র। কিন্তু, আমরা যদি বহতা নদীকে শুধু নদী হিসেবে না দেখে তার পাড়ের খসে পড়া, চড়া পড়া, শ্যাওলা জমা, বহতায় সওয়ার জীব জন্তু মানুষ নৌকা পাথর নুড়ি, বর্ষায় জল বেড়ে যাওয়া গ্রীষ্মে কমে যাওয়া, নদী পাড়ে জেলেদের আনাগোনা, বসতি স্থাপনের চেষ্টা — এই গোটাটা নিয়ে ভাবি — তবে সেই গতিশীলতা আর শুধু গতিময় নদী নয় — গতিশীল নদীব্যবস্থা। অর্থনীতি আর গতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফারাকও এমনই। গতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মোটেই অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক কিছু নয়, যেমন গতিশীল নদীব্যবস্থা মোটেই নদী নয়। নদী বহির্ভূত।

যেমন ধরা যাক, পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বারবার যে কথাগুলো উঠে আসছে — আন্দাজ, আগাম। গ্যারান্টি। কথাগুলো সবই ভবিষ্যতের কল্পনা। ভবিষ্যতকে ছকে নেওয়া। তেমনি উদবৃত্ত মূল্যও আসলে ভবিষ্যৎ। রঙিনতর ভবিষ্যতের হাতছানি। এখানেও একটা চিন্তাপরীক্ষা করা যাক, আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক, একটি কোম্পানি ঠিক করল, তাদের যন্ত্রপাতির নবীকরণ করবে, কারণ তাতে শ্রমদক্ষতা বেড়ে যাবে অনেক। একই পরিমাণ শ্রমসময় ব্যবহার করে অনেক বেশি উৎপাদন করা যাবে। কিন্তু এই নবীকরণে অনেক খরচ হয়ে গেল। ফলে ব্যালেন্স শিটে লাভ এল না। এখানে কিন্তু আপেক্ষিক উদবৃত্ত মূল্য সম্ভবনা তৈরি হল। শ্রমিকরাও মোটের ওপর খুশিই হয় শ্রমদক্ষতা বৃদ্ধিতে। কোম্পানির ভবিষ্যত উজ্জ্বল থাকলে শ্রমিকরাও নিশ্চিন্ত থাকে, কারণ চাকরির নিশ্চিন্তি থাকে, ইনক্রিমেন্ট হয়। এবার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। অ্যাপল নামক কোম্পানিটি ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১১ সাল অবদি তার শেয়ারহোল্ডারদের কোনো ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশ দেয়নি। গোটা লাভ-ই ব্যবসা বাড়ানোতে বিনিয়োগ করে দিয়েছে। বেড়েওছে ব্যবসার বহর। শেয়ারের দাম বেড়ে কয়েক গুণ হয়েছে এই ক'বছরে। কিন্তু যে শেয়ারহোল্ডার, সে তো লভ্যাংশ না পেলে তার নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কিছুই ঢুকল না, তার পকেটে কিছুই এল না। টাকাটা সে বিনিয়োগ করে বসে আছে। কিছু আসছে না। কিন্তু এর ফলে কি অ্যাপলের শেয়ারহোল্ডাররা সব শেয়ার বেচে দিয়ে ধ্বসিয়ে দিয়েছিল অ্যাপল-কে? না। কিন্তু পুঁজিবাজারের সাধারণ নিয়মটা হল — যদি নিয়মিত লভ্যাংশ না দেয় কোনো কোম্পানি, তাহলে সেই কোম্পানির শেয়ার আর আকর্ষণীয় থাকে না। শেয়ার বেচে দেবার প্রবণতা বাড়ে। তাই নিয়মিত লভ্যাংশ দেওয়াটাই নিয়ম। নিয়মিত লভ্যাংশ না দেওয়াটা মিসম্যানেজমেন্ট এবং কোম্পানির হালত খারাপের ইঙ্গিত। কিন্তু অ্যাপলের ক্ষেত্রে এসব কিছুই হয়নি। এখানেও কিন্তু রয়েছে অ্যাপলের ওই উদবৃত্ত

মূল্যের আবেশ। আবার কোম্পানির যদি নাম খারাপ হয়ে যায়, মিডিয়ায় বাজে কভারেজ হয় — তাহলেই কেলো। স্টারলাইট বা কোনো একটা কোম্পানি আদিবাসীদের পবিত্র পাহাড় কেটে খনি তৈরি করতে চাইছে — এই খবর রাষ্ট্র হবার পর এবং এই নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবার পর সম্ভবতঃ নরওয়ের একটি পেনশন ফান্ড, যারা স্টারলাইটের চার শতাংশ শেয়ার কিনে রেখেছিল — সেই শেয়ার ছেড়ে দেয়। শেয়ার ছেড়ে দেওয়া মানেই তাতে কোম্পানির মোট পুঁজি কমে যাওয়া অন্ততঃ কিছুটা। অনেকটা শেয়ার ছেড়ে দিলে শেয়ারের দাম পড়ে যাবার সম্ভবনা তৈরি হয়। ফলতঃ কর্পোরেট স্ট্রাকচারে কোম্পানির মোট পুঁজির যে 'ইকুইটি' অংশটা, অর্থাৎ শেয়ার বেচে যেটুকু — সেটা কমে যায়।

কর্পোরেট স্ট্রাকচারে ইকুইটি ছাড়াও পুঁজির আরেকটা বড়ো অংশ হল লোন বা ঋণ এবং আরেকটি অংশ হল প্রোমোটারের পুঁজি বা মালিকের পুঁজি। অবশ্য শেয়ারেরও একটা বড়ো অংশ মালিকের হাতেই থাকে। মালিককে বলা যেতে পারে শিল্পপতি বা উদ্যোগপতি। পুঁজিপতি আরো বড়ো একটা টার্ম — যার আওতায় শেয়ারহোল্ডাররাও পড়বে। অত্যন্তঃ সামান্য শেয়ার আছে, এমন কেউ বাদ দিলে বাকি সব শেয়ারহোল্ডারকেই পুঁজিপতি বলা যায়। ব্যকরণ মেনে চললে, অত্যন্তঃ সামান্য যার শেয়ার আছে, তাকেও পুঁজিপতি বলাই সঙ্গত।

এবার আসা যাক পেশাদারের ব্যাপারে। পেশাদার (ধরা যাক একজন ফিজিওথেরাপিস্ট) সবসময় নিজের দক্ষতা বাড়িয়ে চলে। সে যত গুণ বাড়াবে, তত তার কাজ পাবার সম্ভবনা বাড়বে। পেশায় টিঁকে যাবার সম্ভবনা বাড়বে। যে কম্পিউটার মেনটেনেন্স করে, তাকে সবসময় আপডেট হতে হয় নতুন নতুন সফটওয়র ও হার্ডওয়ার সিস্টেমের ব্যাপারে। এইভাবেই, আধুনিক পেশাদারকে আপডেট হতে হয়। নিজের শ্রমদক্ষতাও বাড়িয়ে চলতে হয়। এটার মধ্যে দিয়ে সে কী করে? নিজের জনিত আপেক্ষিক উদবৃত্ত মূল্য বাড়িয়ে চলে। সেই উদবৃত্ত মূল্যের তখনই কোনো অর্থনীতিকরণ হয় না, অর্থাৎ, কোনো পুঁজির লাভের খাতায় ধরা পড়ে না। কিন্তু এতে তার শ্রমসময়ের পণ্যযোগ্যতা(বিনিময়যোগ্যতাএবং ব্যবহারযোগ্যতা) বাড়ে। এবং যখন তার শ্রমসময় বিক্রি হয়, তা নিঃসন্দেহে যে পুঁজির পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত হল, তার লাভে যোগ হয়। যেমন, আমরা কোনো নতুন কম্পিউটার কিনতে গেলে বা ল্যাপটপ কিনতে গেলে বা ফ্রিজ বা ওয়াশিং মেশিন কিনতে গেলে প্রথমেই খুঁজি — তার সার্ভিস সেন্টার আছে কি না কাছেপিঠে। সার্ভিস সেন্টার কী করে? সার্ভিস সেন্টার কোনো অভিযোগ পেলেই ওই পেশাদারকে পাঠায় আমার বাড়ি।

যে ব্র্যান্ডের সার্ভিস সেন্টার নেই, সেই ব্র্যান্ডের বিক্রি বাড়ার কোনো কারণ নেই। কোম্পানি আর টেকনিশিয়ান পোষে না বা তার শ্রমসময় অগ্রিম খরিদ করে রাখে না। আগে রাখত। এখন, বরং সে পেশাদারকে ডেকে দেয়, যোগাযোগ করিয়ে দেয়। প্রিন্ট মিডিয়া হাউজ যেমন ফিল্ডের সাংবাদিক পোষে না। পেশাদার সাংবাদিক (ফ্রিল্যান্স) পাঠিয়ে খবর করে নেয়। সেই পেশাদার সাংবাদিক বা ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকের শ্রমদক্ষতা তার নিজের নিজের নিরন্তর অর্জন। তার সুফল বা আপেক্ষিক উদবৃত্ত মূল্য ভোগ করে প্রিন্ট মিডিয়া হাউজটি। যাই হোক, এতক্ষণে আপেক্ষিক উদবৃত্ত মূল্যের অর্থনীতি–বহির্ভুত একটা প্রতিশব্দ পাওয়া গেল। সুফল। অর্থনীতির অন্তর্গত প্রতিশব্দ হল লাভ।[৭]

৪

অর্থনীতির একটি একক যদি পণ্য হয়, আরেকটি হল বাজার। সেই বাজারেরও আবার বিভাজন আছে, কী পণ্য কেনাবেচা হচ্ছে, সেই অনুযায়ী। যেমন, শ্রমসময় বাজার। দ্রব্য এবং পরিষেবা বাজার। পুঁজি বাজার। শ্রমসময় বাজার এবং দ্রব্য ও পরিষেবার বাজারের কথা ওপরে কিছুটা বলা হল। শ্রমসময় বাজারে ক্রেতা হল পুঁজির মালিক। শ্রমিক সেখানে বিক্রি করে তার শ্রমসময়। শ্রমসময় এমন একটা পণ্য যা একবারই ব্যবহার করা যায়। অগ্রিম বায়না করে তারপর তার ব্যবহারের পর দাম চোকানোরই নিয়ম এই পণ্যের। বেনিয়ম, অর্থাৎ অগ্রিম বায়না এবং তারপর ব্যবহারের পরেও দাম না চোকানোর অর্থনীতি–বহির্ভুত ব্যাপারটি শ্রমবাজারে বহুল প্রচলিত। এবং তাতে শ্রমসময়ের যে ক্রেতা সেই পুঁজির মালিকের কোনো শাস্তি হয় না। বড়ো জোর, খুব শোরগোল পড়লে দামটা চুকিয়ে দেওয়া হয়। এইটা কীভাবে চলতে পারে? চলতে পারে, কারণ — বাজারের যে সমানতার বড়াই — যে কারণে বাজারের এত সুনাম অর্থনীতিতে — শ্রমবাজারে সেই সমানতা নেই। এখানে ক্রেতা অর্থাৎ পুঁজির মালিক বিক্রেতা অর্থাৎ শ্রমিকের তুলনায় বেশি ক্ষমতাবান। শ্রমিকের জোট অর্থাৎ ইউনিয়ন ইত্যাদি এই ক্ষমতার তফাতে সাম্য আনার চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রেতা অর্থাৎ পুঁজির মালিক সবসময়ই চায়, এই ক্ষমতার সাম্য যাতে না আসে। এছাড়া দ্রব্য পণ্য ও পরিষেবার বাজার, যা আমাদের দৈনন্দিনের

[৭]এই অংশটা এবং এর পরবর্তী কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে কিছু কিছু কঠিনতর ধারনা পেতে ব্রায়ান মাসুমি–র 99 thesis on revaluation of value বইটা পড়া যেতে পারে। ক্রিপটোকারেন্সির থিসিসগুলি বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত থিসিস এবং সংলগ্ন লেমা এবং স্কলিয়ামগুলি খুবই উপভোগ্য।

সবচেয়ে চেনা।

আর আছে পুঁজির বাজার। পুঁজি বাজার যে কেনো বাজার তা আমার আজো মাথায় ঢোকে না। যাই হোক, পুঁজি বাজার বড়ো বিচিত্র। এর একটা অঙ্গ ধার। অনেকে অবশ্য তা মানতে চায় না, যাই হোক। কর্পোরেট পুঁজির একটা অংশ হল ব্যাঙ্ক বা লগ্নিসংস্থাগুলির কাছ থেকে ধার। ধার হয় দীর্ঘমেয়াদী, অন্ততঃ এক বছর। ব্যাঙ্ক এইজন্য ধার দেয়, যাতে সেই পুঁজি খাটিয়ে সুদসহ তা শোধ দেয় কর্পোরেট। সেই সুদসহ ফেরতের ফলে ব্যাঙ্ক আবার তার গ্রাহকদের সুদ দিতে পারে। অর্থাৎ, এই ব্যাঙ্কলোনের মাধ্যমে আমাদের অর্থাৎ, ছোটোখাটো ব্যক্তিদের সঞ্চিত ধন কর্পোরেটের মূলধন-এ পরিণত হয়। বিনিময়ে আমরা চাই, যেহেতু মুদ্রা হিসেবে জমা রাখছি, তার কিছু বাড়তি সুদ। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রার দাম কমে। হ্যাঁ, মুদ্রা নিজেও একটা পণ্য। মুদ্রারও বাজার আছে। সে কথা এখন থাক। তবে শুধু কর্পোরেট নয়, কৃষক থেকে শুরু করে ছোটো ব্যবসায়ী, বাড়ি বা গাড়ির জন্য ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ — সবকিছুতেই কিন্তু সুদ হয়। সামগ্রিকভাবে গোটাটাই পুঁজিবাজারের অন্তর্গত। ব্যাঙ্ক ছাড়াও এনবিএফসি বা লগ্নি সংস্থা ঋণ দেয়। এই লগ্নি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রকে বলে ইংরেজিতে নন-ব্যাঙ্কিং ফাইনান্সিয়াল সেক্টর। ঋণের শর্ত, বন্ধকী, সময় এবং অবশ্যই সুদ — এসব খুব গুরুত্বপূর্ণ ঋণের ক্ষেত্রে। এছাড়া পুঁজির বাজারে আছে বণ্ড ইস্যু করা এবং তার বিক্রি। মূলতঃ সরকার, মিউনিসিপালিটি, এবং অনেক সময় কর্পোরেটরা বণ্ড ইস্যু করে একটা নির্দিষ্ট সুদ দেবে বলে এবং একটা দীর্ঘমেয়াদী সময়কালের জন্য। এই বন্ড-এ একটা নিরাপত্তার ব্যাপার থাকে। পেনশন ফান্ড, হেজ ফান্ড, ব্যাঙ্ক, লগ্নী সংস্থা বা ধনী ব্যক্তিরা সেগুলি কেনে। এটা হল প্রাথমিক পুঁজি বাজার। দু-নম্বরী পুঁজিবাজারে আবার এই বন্ডগুলি বিক্রি করে তারা, সেগুলোর কেনাবেচা চলে । এই দু-নম্বরী পুঁজি বাজারে তাৎক্ষণিক আয় হয়, এবং শেয়ারবাজারে এই কারবার চলে। পুঁজিবাজারের আরেকটি অঙ্গ হল শেয়ার। অনেকের মতে, এই শেয়ার বা ইকুইটি-ই হল আসল পুঁজিবাজার। কারণ, এই ইকুইটি বা শেয়ার কেনে যারা, তারাই সত্যিকারের ইচ্ছুক পুঁজিপতি বা পুঁজি বিনিয়োগকারী (অন্যদিকে, ব্যাঙ্ক বা লগ্নি সংস্থার থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের মাধ্যমে যে পুঁজি, তা আসলে ব্যাঙ্ক বা ওই সংস্থার গ্রাহকদের জমানো টাকা বা সঞ্চিত ধন, যা সে চোর ডাকাতের হাত এড়িয়ে এবং মূল্যবৃদ্ধি সূচকের থেকে একটু বেশি সুদে নিরাপদে রাখার জন্য ব্যাঙ্কে রেখেছে, তার মূলধনীকরণ)। প্রোমোটার বা মালিক বা উদ্যোগপতি বা শিল্পপতি

আইডিয়ালি বিনিয়োগকৃত পুঁজি এবং উদ্যোগের মালিকানাও ভাগ করে নেয় অন্যান্য পুঁজিপতিদের সাথে, কোম্পানির শেয়ার ছাড়ার মাধ্যমে তাকে কর্পোরেটে পরিণত করে। তাতে অনেকসময় অভিযোগ ওঠে, উদ্যোগের স্বার্থ বা শিল্পের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না, কারণ পরে শেয়ার কিনে পুঁজি যুক্ত করে যারা মালিকানার ভাগ নিয়ে নিল, তারা বস্তুত ওই উদ্যোগের স্বার্থ বা শিল্পের স্বার্থ ভেবে নেয়নি, নিয়েছে বেশি লাভের কথা ভেবে। লগ্নির সর্বোচ্চ লাভের জন্যই তারা এই কোম্পানির শেয়ার কিনেছে। যদি দ্যাখে, অন্য কোম্পানি বা অন্য সেক্টরে বেশি লাভ হচ্ছে, সে এই কোম্পানির শেয়ার বেচে দিয়ে চলে যাবে। এই কর্পোরেট মালিকানা বা শেয়ার (বা ইকুইটি) মালিকানার মাধ্যমে পুঁজি তার শেষ পিছুটান, অর্থাৎ, কোন শিল্পে লগ্নি হচ্ছে বা কোন মালিকের হাতে লগ্নি হচ্ছে — এইসব জাগতিক পিছুটান কাটিয়ে ওঠে। লগ্নি পুঁজি হয়ে ওঠে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পুঁজি। সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পুঁজিপতি হয়ে ওঠে তারা, যাদের কেবল লগ্নি পুঁজির কারবার। কোনো শিল্প, কোনো উদ্যোগের কোনো কারবার নেই। মানুষের জাগতিক জীবনযাপনের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ। অর্থনীতির আইডিয়ালিজমের একমাত্র অবতার। অর্থনীতির সারাৎসার। পণ্য বাজার এবং শ্রম বাজারের সাথে জাগতিক জীবনযাপনের যে অবিচ্ছেদ্যতা আছে, পুঁজি বাজারের সঙ্গে তা নেই। ব্যাঙ্কঋণ বা অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির ঋণ মারফত যে পুঁজি, বা বন্ড কেনা মারফত যে পুঁজি, তাতে মানুষের বা নির্বাচিত সরকারের সংস্থাগুলির নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় লেপ্টে থাকে। প্রোমোটারের নিজস্ব যে পুঁজি, যা সে বিনিয়োগ করছে কোনো একটি প্রকল্পে, তার মধ্যে সেই মোতাবেক দ্রব্যপণ্য বা পরিষেবাপণ্য উৎপাদনের, যা লোকে কিনবে এবং ভোগ করবে, তা লেপ্টে থাকে। পুঁজিবাজারের এই দুটি অঙ্গের সঙ্গে জীবন যাপনের যোগ থাকলেও ইকুইটি বা শেয়ার অঙ্গের সঙ্গে এর যোগ নেই। এইখানে পুঁজি হয়ে যায় আপাতদৃষ্টিতে অটোনোমাস বা স্বয়ংক্রিয়।[৮]

৫

এই জাগতিকের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্করহিত পুঁজিই হল জাগতিক পুঁজি। পিছুটানওলা পুঁজিগুলি বড়োজোর সঞ্চিত ধন সম্পদের মূলধনীকরণ। কিন্তু

[৮]পুঁজি কীভাবে কর্পোরেট কাঠামোয় চলে গেল আস্তে আস্তে, তা জানতে Brown, Bruce. The History of the Corporation (2003) এটা পড়া যেতে পারে। এবং কর্পোরেট ফাইনান্সের ওপর একটি দারুণ বই আছে — Paul Asquith, Lawrence A. Weiss - Lessons in Corporate Finance : A Case Studies Approach to Financial Tools, Financial Policies, and Valuation (2019, Wiley)

জাগতিক পুঁজি হল মানুষের জীবনযাপনের পিছুটানহীন। একটা স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক ব্যাপার। একটা মোহমুক্ত মহিমা। একটা যুক্তিক্রম এবং চিন্তাপদ্ধতি। একটা আধিভৌতিক জিনিস। মার্ক্সের মতে পুঁজি হল একটা সামাজিক সম্পর্ক। যদি তাই হয়, তাহলে তা নিশ্চয়ই আন্তঃব্যক্তি। কিন্তু পুঁজি কি শুধু আন্তঃব্যক্তি? তার কি কোনো মন নেই? শুধু সমাজ? শুধু শরীর? দু'জন ব্যক্তির মধ্যে পুঁজিসম্পর্ক স্থাপিত হলে তা কি দুটি ব্যক্তির মনোভঙ্গীতে কোনো পরিবর্তন সাধন করে না? এবং সেই মনোভঙ্গী কি শুধু দুটো ব্যক্তির নিজস্ব বা পারস্পরিক? নাকি সেই মনোভঙ্গী যেমন পারস্পরিক, তেমনি তাদের নিজস্বও। তাদের সমাজের প্রতি মনোভঙ্গী এবং সমাজের তাদের প্রতি মনোভঙ্গীও। ফলতঃ পুঁজি শুধু সামাজিক সম্পর্ক নয়। শুধু সম্পর্ক নয়। তা মনোসামাজিক। পুঁজি হল সামাজিক সিঁড়ির সিমেন্ট। শুধু তা নয়। এবং, পুঁজি হল উর্ধটান, যা ওই সামাজিক সিঁড়ি বেয়ে উঠতে সহায়তা করে।[৯]

কর্পোরেট চরিত্রে পুঁজি তার স্বমহিমা খুঁজে পাবার মধ্যে দিয়ে, আপাত স্বয়ংক্রিয়তায় উপনীত হবার মধ্যে দিয়ে সমাজের প্রতিটি কোণে কোণে তার সৃজন ও বাড়বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়। অথবা, এই স্বয়ংক্রিয় লগ্নি পুঁজি একটা দৃষ্টিকোণ তৈরি করে। পুঁজি যেহেতু মনোসামাজিক, অতএব সে সমাজের মধ্যে ব্যক্তি বা যে কোনো একক-কে বেয়ে জন্ম নিতে পারে যে কোনো সময়। পুঁজির বস্তু-অস্তিত্বের বদলে অবস্তু-অস্তিত্ব আগেই জানা হয়ে গেছিল। পুঁজি মানে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, শ্রমসময় দিয়ে গঠিত কিছু নয়। পুঁজি মানে প্রচুর টাকা নয়। পুঁজি মানে প্রচুর ধনসম্পত্তি নয়। এগুলোর আবেশ হল পুঁজি। এবং পুঁজি সবসময়েই অগ্রিম। কারণ, উদবৃত্ত মূল্যের উৎপাদনের মধ্যে দিয়েই কেবল পুঁজি তার পুঁজি চরিত্র পায়, নইলে সে তো খুব বেশি হলে ধনসম্পত্তি। ফলতঃ পুঁজি অবস্তু। এবং অবস্তু পুঁজির সৃজনের প্রক্রিয়া, পুঁজিকরণ বা মূলধনীকরণ (ক্যাপিটালাইজেশন), তা পুঁজির চেয়েও মৌলিক। পুঁজি স্বয়ংক্রিয় নয়, স্বয়ংক্রিয় হল পুঁজিকরণ। পুঁজিকে জড়ো করা (অ্যাকুমুলেশন অফ ক্যাপিটাল) হয় না, জড়ো করা হয় ধনদৌলত, টাকা

[৯]সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে যে স্বেচ্ছাবৃত্ত ব্যাপার থাকে, একধরনের সমতার প্রত্যাশা থাকে, এবং সম্পর্ক থাকা মানেই সম্পর্ক না থাকারও স্বীকৃতি থাকে, পুঁজি সম্পর্কে সেসব নেই। পুঁজি সম্পর্ক বাধ্যতামূলক। সম্প্রসারণ এবং পরিসরটি পুরো দখল করে নেবার প্রবণতা যেহেতু পুঁজির অন্তর্নিহিত, তাই সে জীবন্ত শ্রমকে সে একটি নির্দিষ্ট পরিসরে তার লগ্ন হতে বাধ্য করে। এবং পুঁজি সামাজিক কৌলিন্যের উর্ধতম জায়গাটি খুব দ্রুত দখল করে নেয়, যেহেতু সম্পদ সৃষ্টি ও কুক্ষিগত করার ব্যাপারে তার তুল্য কেউ নেই। ফলে পুঁজি একটি উর্ধটানও বটে।

ইত্যাদি। সেগুলোর পুঁজিকরণের লক্ষ্যে। পুঁজিকরণ মানে একজায়গায় জড়ো করা নয়, পুঁজিকরণ মানে উদবৃত্ত মূল্যের আত্মসাৎ-এর বাসনা। পুঁজি হল ভবিষ্যতের বা নয়া কিছুর সারাৎসার নিজের বর্তমানের মধ্যে আত্মসাৎ-এর বাসনাযন্ত্র। যেভাবে পুরুষ চায় নারীকে নিজের ঔরসে সন্তানবতী করতে, অনেকটা সেরকম। পুঁজিবাদ হল এই বাসনাযন্ত্রের আধিপত্য। পুঁজিকরণ অর্থনীতি বহির্ভুত।[১০]

পুঁজি থেকে আমরা এসে পৌঁছলাম পুঁজিকরণ-এ। পুঁজিকরণ থেকে উদবৃত্ত মূল্যের বাসনায়। যে উদবৃত্ত মূল্য হল সুফল, যা মোটেই অর্থনীতি পরিবেষ্টনে বাঁধা কিছু নয়, যা তাকে ছাপিয়ে চলে যায় জীবনের মধ্যে, জীবনযাপনের মধ্যে। জীবন মানে কোনো সময় পরিসর নয়, প্রাণের প্রবাহ। জীবনযাপন বা যাপন মানে কোনো দিনগত পাপক্ষয় নয় বা মৃত্যুর অপেক্ষা নয়। জীবনযাপন মানে জীবন্তের উদযাপন। আমাদের যে কোনো নতুন কিছু শেখা, বা পুরনো শিক্ষায় শান দেওয়া হল উদবৃত্ত মূল্যের বাসনা। বাগানে চারটে পেঁপে গাছ লাগানো, নতুন ফুলের টব কিনে আনা, কম্পোস্ট সার কিনে আনা বা তৈরি করা, পরের ম্যারাথনের জন্য তৈরি হওয়া, মেয়েকে ফুটবল কোচিং-এ পাঠানো বা ভালো স্কুলে ভর্তি করা, সন্তানের ইচ্ছা, বাচ্চা ভালোবাসা, উপহার বা প্রাইজ পাওয়ার ইচ্ছা, ফেসবুকে একটা ছবি আপলোড করা বা কয়েক প্যারাগ্রাফ লেখা, প্রবল দুঃসময়ের ত্রাণে চাল ডালের চেয়েও লাইটার বা টর্চলাইট পাবার ইচ্ছা, সাধারণ ব্যাটারির টর্চের বদলে রিচার্জেবল ব্যাটারির টর্চের দিকে ঝোঁকা, সমৃদ্ধি সুখ তৃপ্তি সাচ্ছন্দ্যের প্রত্যাশা করা, নিজের এবং অন্যদের, আরো বেশিদিন ইয়াং থাকার ইচ্ছা, আরো বেশিদিন সবলভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছে — সংক্ষেপে, যা আছে

[১০]পুঁজি এবং পুঁজিকরণের মনোসামাজিক চরিত্র মোটেই মনোগতও নয়, সামাজিকও নয়। সম্পর্ক হিসেবে সামাজিক কেন নয়, সেটা আগের নোটে বলা হয়েছে। চরিত্রগত হিসেবেও তা সামাজিক নয়। সমাজের মধ্যে একাংশের রিক্ততা ছাড়া, অর্থাৎ, 'শ্রমশক্তি ছাড়া তার আর কিছুই বেচার নেই', এবং অন্য ক্ষুদ্র অংশের বিত্তের অপার বাহুল্য ছাড়া, পুঁজি তৈরি হয় না সমাজের মধ্যে থেকে। অখণ্ড সমাজ (যেখানে সবাই সমান হিসেবে জন্মায়) পুঁজি তৈরি করতে পারে না। তাই পুঁজি সামাজিক নয়। আবার পুঁজি বা পুঁজিকরণ মনোজাগতিক কিছুও নয়, কারণ কেউ চাইলেই পুঁজি তৈর করে ফেলতে পারে না, তা ব্যক্তিগত অভাবপূরণ জনিত কিছু নয়, তার বাস্তব পূর্বশর্ত লাগে, যার কথা আগে বলা হল। কিন্তু পুঁজি মনোসামাজিক। অর্থাৎ, সে সমাজের সামুহিকতার দোহাই ও সম্মতি নিয়ে সমাজের খণ্ড-র মাধ্যমে নির্ধারিত বা প্রকাশিত হয়। পুঁজি-র চেয়েও পুঁজিকরণ মৌলিক, কারণ পুঁজিকরণ হল পুঁজির হওয়া, গতিশীল অস্তিত্ব। হয় বা বিয়িং এবং হওয়া বা বিকামিং-এর মধ্যে হওয়া-র গুরুত্ব কোথায়, তা জিলবের সিমন্দঁ-র ব্যক্তিকরণ-এর ধারনার মধ্যে পাওয়া যাবে। দ্রষ্টব্য — ''চাপ না নিয়ে'' (শমীক সরকার, ভাষ্য প্রকাশনী, পৃ ১০০)

তার চেয়ে বেশি থাকার প্রত্যাশা করা, পাওয়া-র থেকে বেশি চাওয়া — এ সবই হল উদবৃত্ত মূল্যের বাসনা। উদবৃত্ত মূল্য হল জীবনীশক্তি। অন্তহীন অতৃপ্তি।

তাহলে কী দাঁড়ালো? পুঁজিকরণ মানে উদবৃত্ত মূল্যের আত্মসাতের বাসনা। পুঁজি হল উদবৃত্ত মূল্যের আত্মসাতের বাসনা যন্ত্র। পুঁজিবাদ হল স্থান ও কাল পরিসরে এই বাসনাযন্ত্রের আধিপত্য (অতএব রাজনৈতিক)। আবার উদবৃত্ত মূল্য হল সুফল। জীবন্তের উদযাপন। আত্মসাৎ বা কুক্ষীগত করাটাই প্যাঁচের ব্যাপার।

অর্থনীতির আলোচনায় পুঁজি যেভাবে বিশ্লেষিত, শ্রম কি ততটা বিশ্লেষিত? না। অর্থনীতির আলোচনায় শ্রম ধরা পড়ে না। শ্রমসময় এবং শ্রমক্ষমতা ধরা পড়ে। শ্রমদক্ষতা ধরা পড়ে। শ্রমসময় এবং শ্রমক্ষমতা শব্দদুটির মধ্যেই আছে, শ্রমকে আলোচনায় না আনা। শ্রম পুঁজির চেয়ে অনেক বেশি দুর্বোধ্য।

মানুষ কাজ করে কেন? মানুষ কিছু করে কেন? মানুষের যা কিছু করা-ই কি শ্রম? না, মানুষের যা কিছু করা-ই অর্থনীতির 'শ্রম'-এর মধ্যে পড়ে না। অর্থনৈতিক সংকীর্ণতায় মানুষের যে করা কোনো না কোনোভাবে পণ্যায়িত হতে পারে, তা-ই কেবল শ্রম। এবার করা-কে যেহেতু করা-র আগেই পণ্যায়িত হতে হয়, কারণ, করা কেবল করা-র সময়ই 'মূল্য সৃষ্টি করা'র মাধ্যমে ব্যবহৃত হয় বা ইউটিলাইজড হয়, তাই জন্য শ্রমক্ষমতা বা শ্রমশক্তি হল পণ্য। শ্রম পণ্য নয়। করতে পারব — এইটা হল পণ্য। করব — এইটা হল পণ্য। এবার, সমস্ত করাই পণ্যায়িত হতে পারবে না। কারণ, সমস্ত করাই করার সময় মূল্য সৃজন করতে পারে না, ব্যবহার মূল্যই হোক বা বিনিময় মূল্য। ধরা যাক, আমি একটা খবরের কাগজ নিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলাম, তারপর টুকরোগুলোকে আঠা দিয়ে জোড়া লাগালাম। এই শ্রমের কোনো দাম নেই। কিন্তু যদি আমি ছেঁড়াটায় একটা কায়দা রাখতে পারি এবং আঠা দিয়ে জোড়া লাগাটায় কায়দা রাখতে পারি, তাহলে হয়ত তা একটি কোলাজের জন্ম দিতে পারে। এখানে একটা জিনিস বলে রাখা প্রয়োজন। মানুষ তার স্বাভাবিকতাতেই (ইংরেজিতে বলা যেতে পারে ইনেটনেস) ওই ছেঁড়া এবং জোড়া লাগানোয় কায়দার স্বাক্ষর রাখে। অর্থাৎ নিজস্ব কায়দা। যাই হোক, সেই কোলাজ যদি আমি বিক্রি করি, এবং কেউ পছন্দ করে কিনে নেয়, তাহলে আমার ওই ছেঁড়া এবং জোড়া লাগানোর বিনিময় হল। কিন্তু তা অর্থনীতির আওতায় এল না। বিনিময় এবং টাকার লেনদেন সত্ত্বেও তা অর্থনীতির আওতাধীন হলো

না। কারণ, কোলাজটির কত দাম, তার ওপর দাঁড়িয়ে ঠিক হল ওই ভাবা-ছেঁড়া-জোড়ার মোট দাম কত। ভাবা-ছেঁড়া-জোড়ার কোনো স্বাধীন সমাজনির্ধারিত দাম এক্ষেত্রে নেই। ওই কোলাজটিরও নেই।

ওপরের উদাহরণটি আরেকটু এগোনো যাক। একেবারেই কিছু না ভেবে ছেঁড়া ও জোড়া লাগানোর কোনো মানে নেই। কিন্তু ছেঁড়ার আগে, বা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ভাবা এবং একটা কায়দায় ছেঁড়া, এবং তারপর জোড়া লাগানোর সময় সেই ভাবনার মোতাবেক এগোনো — তা নিশ্চিতভাবেই একটি কোলাজের জন্ম দেয়। এই কোলাজের হওয়ার পর, আমি যদি সেটাকে বিক্রি করি, তাহলে আমার ছেঁড়া ও জোড়া লাগানোটি পণ্য হল। কিন্তু আমি আদৌ সেটা বিক্রি করতে যাব কেন? তা বিক্রি করে আমার যদি কিছু টাকা হয়, যা আমার প্রয়োজন অন্য কিছু কেনার জন্য, তাহলে তার মানে আছে। নইলে আমি কেনই বা বিক্রি করব? উদাহরণটিকে আরেকটু খেলানো যাক। এবার ধরা যাক, একবার বিক্রি হল দেখে উৎসাহিত হয়ে আমি ওইরকম করতেই থাকলাম। এবং সেটা যাতে নিরন্তর করে চলা যায়, তার জন্য পরিকল্পনা করে ফেললাম। অতএব, এটা একটা স্বনিযুক্ত কারবারে পরিণত হয়ে গেল। এইবার আমার কাজটির শ্রমকরণ হল। ভাবা-ছেঁড়া-জোড়া-র শ্রমকরণ হল। ফলতঃ আমরা বলতে পারি, অর্থনীতিতে শ্রমকরণ হল শ্রমের চেয়েও মৌলিক। শ্রমকরণের মাধ্যমে করা অর্থনীতির মধ্যে ঢোকে। যেমন, পুঁজিকরণের মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টি হয়। এই শ্রমকরণ কিন্তু আসলে পুঁজিকরণের শ্রম-রূপ। শ্রমকরণ শ্রমক্ষমতাকে তার জীবনযাপনের বাসনা থেকে বিচ্যুত করে তাকে উদবৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ-এর বাসনা-যন্ত্রের শ্রমাকার-এ পরিণত করে।

মার্ক্সের মতে, জীবন্ত শ্রম হল স্বাধীন, এবং পুঁজি হল মৃত শ্রম। অবশ্য জীবন্ত শ্রমের যে কোনো ফসলের মধ্যেই সেই শ্রমের ফসিল থাকে। পুঁজি অবতারে মৃত শ্রম জীবন্ত শ্রমের পিছু ধাওয়া করে। তাকে অর্থনীতির মধ্যে এনে নিজের উদবৃত্ত মূল্যের খিদে পূরণ করে। কিন্তু শ্রম-কে জীবন্ত অভিধা বা বিশেষণ দিতে হল কেন? কারণ, পুঁজির মতোই শ্রম-ও হল অর্থনৈতিকের বাইরে থেকে অর্থনৈতিকের ভেতরে প্রবেশের চৌকাঠ। অর্থনীতির দুয়ার হল পুঁজি ও শ্রম। পুঁজিকরণ এবং শ্রমকরণের মাধ্যমে অর্থনীতির বাইরে থেকে তার ভেতরে প্রবেশ করা হয়। যাপনের দুনিয়া থেকে উপস্থাপনের দুনিয়ায় প্রবেশ। পুঁজি যেমন ঐশ্বরিক, বিষ্ণু। শ্রমেরও তেমনি দেবতা হয়। বিশ্বকর্মা। কতগুলো ইঁট, সিমেন্ট, বালি, সুরকি, চুন, জল, কোদাল, বেলচা, ওলন দড়ি, আর ডিজাইন — এইসব জিনিসপত্র

হাতে পেলে শ্রম তা দিয়ে বানিয়ে দেয় সুদৃশ্য অট্টালিকা, কিছুদিনের মধ্যেই। এই শ্রমও বিমূর্ত। যত চৌকাঠ পেরোনো দক্ষতাই থাকুক না কেন, সময়কাল জুড়ে নিয়োজিত না হলে সেই শ্রমদক্ষতা কিছুই সৃজনে অক্ষম। দক্ষতা বা অদক্ষতা নয়, কোনো দৈহিক মানসিক ক্যাটেগরি নয়, কোনও নির্দিষ্ট কাজের সংশ্লিষ্ঠও নয়, বিমূর্ত শ্রম যেন এক পারঙ্গমতা। পারা–র আরতি। সক্ষমতার প্রতিরূপ। সক্ষমতার যে প্রতিরূপের কথা মনে পড়ে মানুষের বানানো মহান বা মহতী কিছু দেখলে। মিশরের পিরামিড। তাজমহল। এয়ারপোর্টে নামার সময় এরোপ্লেন থেকে কলকাতা। হাইডাল স্টেশনের টারবাইন। থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট। আকাশছোঁয়া টাওয়ার বাড়ি। হুগলী সেতু। মিয়াজাকির অ্যানিমেশন সিনেমা। বিমূর্ত শ্রমের এই দেবকল্প প্রতিরূপের বিপরীতে মূর্ত বা জীবন্ত শ্রম হল জীবনযাপন। জীবন্তের উদযাপন। বানানো মহান বা মহতী কিছুর পরতে পরতে লুকিয়ে থাকে এই জীবন্ত শ্রমেরই অসংখ্য প্যাকেটবদ্ধ, ছাঁচে ঢালা, বিচ্ছিন্ন, বা এমনকি রিক্ত রূপ। কিন্তু বানানো মহান বা মহতী কিছুর মনোজাগতিক উপস্থাপনায় সেই মূর্ত বা জীবন্ত শ্রম আসে না। তাজমহল দেখলে শ্রমের যে ছবিটি মাথায় আসে, তা হল হাজার হাজার শ্রমিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে শ্বেতপাথর পালিশ করে করে তাতে আকার দিচ্ছে। কিন্তু এটা মাথায় আসে না, — দুটো পালিশ দিয়ে শ্রমিকটি একটু বিশ্রাম নিল। তারপর একটা বিড়ি ধরালো। বিড়িটা ফেলে আরো দুটো পালিশ দিল। তারপর খেতে বসল। খেয়ে উঠে একটু গল্প করে নিল বিড়ি খেতে খেতে। তারপর আবার দুটো পালিশ দিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে যেই দেখল লালচে হয়ে গেছে ডুববে ডুববে, অমনি যন্তর–টা জল দিয়ে ধুয়ে হাত পা ধুয়ে নিয়ে মাথায় একটু জল দিয়ে চুলটা পকেট থেকে চিরুনি বের করে আঁচড়ে নিয়ে কনট্রাক্টরের কাছে দিনের মজুরিটা বুঝে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। এমনকি, যে লোকটা একা হাতে পাহাড় সরিয়েছিল, সেও নিশ্চয়ই একটানা বাটালি চালিয়ে গিয়ে পাহাড়টা সরায়নি। রোজ একটু একটু করে কেটেছে পাহাড়টাকে। তারপর বাড়ি গিয়ে খেয়েছে দেয়েছে আড্ডা দিয়েছে ঘুমিয়েছে। ফের পরদিন। মাঝে মাঝে ছুটিও নিয়েছে। জীবন্ত শ্রম (বা, করা) এবং উদবৃত্ত মূল্য — দুটিই হল জীবন্তের উদযাপন।

জীবনে শ্রমকরণ হ্রাস শ্রমক্ষমতাকে জীবনযাপনের বাসনায় উন্মুক্ত রাখে। দৈনন্দিনের যতটা সময় শ্রমকরণের আওতা থেকে বাইরে থাকা যায়, ততই জীবন্ত শ্রম রয়ে যায় জীবন্ত। তা জীবনযাপনের মধ্যে থেকে যায়। এবং এটা সরলরৈখিক নয়। কারণ দৈনন্দিন শ্রমকরণের সময়–পরিসর

বাকি সময়ের শ্রমক্ষমতার হ্রাস ঘটায় প্রগতিতে। যে আটঘন্টা শ্রমকরণে যুক্ত থাকে, তার পক্ষে দৈনন্দিনের বাকি সময় যতটা জীবনযাপনে অর্থাৎ জীবন্তের উদযাপনে যুক্ত থাকা সম্ভব, যে দু–ঘন্টা শ্রমকরণে যুক্ত থাকে, তার পক্ষে দৈনন্দিনের বাকি সময়ে শুধু হিসেবে বিয়োগ করে যা আসে তা নয়, তার চেয়ে অনেকটাই বেশি জীবনযাপনে যুক্ত থাকা সম্ভব। জীবন্ত শ্রমের সময় একক হয় না। সময় একক হয় শ্রমকরণের। জীবন্ত শ্রম সবসময়ই গুণগত। জীবন্ত শ্রম হল শিল্প। ঠিক তেমনি, জীবন্ত শ্রমের ক্যাটেগরি হয় না। ক্যাটেগরি একান্তভাবেই শ্রমকরণের ব্যাপার। শারীরিক শ্রম, মানসিক শ্রম, অথবা, ফিটার শ্রম, সেলসম্যান শ্রম — এগুলি সবই শ্রমকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ। জীবন্ত শ্রমের এরকম কোনো ক্যাটেগরি বা বিভাজন হয় না। আলাদা আলাদা ক্ষেত্র হয় না। তা জীবন উদযাপনের ব্যাপার। বাসন মাজা থেকে রান্না, ছবি আঁকা থেকে নভেল লেখা, ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে দৌড়নো, বাগান বা ক্ষেতে কাজ করা থেকে প্রাণের আনন্দে খেলা, অন্যের জন্য কোনো কাজ করে দেওয়া থেকে শ্বেতপাথর পালিশ — সমস্ত কিছুই জীবন্ত শ্রম। সমস্ত কিছুই জীবনের উদযাপন। জীবন্ত শ্রমের খরচ হয় না। জীবন্ত শ্রম সবসময় জমা। এবং জীবন্ত শ্রম সবসময় সামাজিক। ব্যক্তিক নয়। এমনকি ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব জীবন্ত শ্রমও (তথাকথিত সেলফ কেয়ার বা সেলফ লাভ বা মি–টাইম) সামাজিক। যে পরিমাণে আমাদের জীবনযাপন সামাজিক, তার প্রভাব পড়ে সমাজে। প্রত্যক্ষভাবে অন্যের জন্য করা এবং যাকে বলে, সমাজকর্ম বা সমাজের জন্য করা — তা প্রত্যক্ষভাবে জীবন্তের উদযাপন। জীবন্ত শ্রম ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনযাপনে প্রাণের বিস্তার ঘটায়। 'গল্প হলেও সত্যি' সিনেমার মতো। জীবন্ত শ্রম বর্ষার মতো — প্রাণের সঞ্চার, প্রাণের বিস্তারের মাধ্যমে সে সামাজিক মানুষকে ও মানুষিক সমাজকে সজীব রাখে। কবীরের দোঁহায় ছিল, আধ জনম হাম নিদে গোঙায়লু। ঠিক তেমনি জীবনে কতটা সময়, বছর ধরে, দশক ধরে, মাস ধরে এবং দিন ধরে — শ্রমকরণে ব্যয় হল — তার হিসেব রাখা এবং তাকে কমানো এবং কম রাখা — অর্থনীতি থেকে অনর্থের দিকে যাত্রার, উত্তর–পুঁজিবাদের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে এ এক গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি।[১১]

[১১]সিমন্দঁ বলেছিলেন, শ্রম একইসাথে সামাজিক এবং ব্যক্তিগত। "চাপ নিয়ে নিয়ে"–তে কোট করা আছে — 'শ্রমকে ধরা হয় তখন ব্যক্তিগত অভাবের পূরণ রূপে, মানুষের একটি এসেন্স বা সারবস্তু–র সাপেক্ষে, সামুহিক, কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে নির্ধারিত। আত্মা ও শরীরের মধ্যেকার অস্তিত্বের মধ্যে কাজ করে (যা শারীরিক শ্রমের ধারনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এবং বৌদ্ধিক শ্রমের ধারনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, শ্রমের ওই দুই স্তরের মধ্যে থাকবন্দী

শ্রমকরণের মধ্যেও কাজটায় প্রাণসঞ্চার ঘটায় মানুষ। কারণ, শ্রমকরণে মৃতশ্রমের লগ্ন হয় জীবন্ত শ্রম। যখন জীবন্ত শ্রম এইভাবে প্রতিদিন মৃতশ্রমের লগ্ন হয় — সেই সময় পরিসরে, সে যেহেতু জীবন্ত শ্রম, তাই সে ওই সময় পরিসরটুকুতে জীবন্তের উদযাপন তৈরি করে যতটুকু সম্ভব। খাটুনি আর শুধু খাটুনি থাকে না। তার মধ্যেই ছন্দ তৈরি হয়। তার মধ্যেই নবীকরণ এবং পুনর্নবীকরণ তৈরি হয়। তারমধ্যেই লক্ষ্য ও লক্ষ্যপূরণ তৈরি হয়। তাই তার মধ্যেই যতটা সম্ভব আসে শিল্প। শ্রমসময়ের টানাটানি এবং যান্ত্রিকতা তাকে প্রাণসঞ্চারে বাধা দেয়। কিন্তু প্রাণসঞ্চারের মধ্যে যে যাদু আছে — তা এবং তার অভাব উদবৃত্ত-মূল্যের আত্মসাৎ-এর বাসনা-যন্ত্রও বুঝতে পারে। তাই যে শ্রম ক্যাটেগরিতে শিল্পগত মূল্য বেশি, সফটঅয়র সেক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, ডিজাইনার, অভিনেতা, গবেষক, শিক্ষক, প্রশিক্ষক, খেলোয়াড় ইত্যাদি — সেখানে যতটা সম্ভব এই শ্রমসময়ের টানাটানি এবং যান্ত্রিকতা কম রাখা হয়।

অপরপক্ষে, পুঁজিকরণ হ্রাসের কোনো ব্যক্তিক কর্মসূচী নেই বা হয় না। পুঁজিকরণ হ্রাসের কর্মসূচী সবসময়ই সামাজিক। ব্যক্তি পুঁজিপতির ক্ষুদ্রতরকরণ, তাকে আরো ছোটো করে ফেলা এবং পুঁজিকরণকে ব্যক্তিক না রেখে সামাজিক ও সমূহের কর্মসূচীতে বদলে ফেলা, এবং শুধু তাই নয়, পুঁজিকরণকে আশু উদ্দেশ্যভিত্তিক, আপৎকালীন ও ক্ষণস্থায়ী কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ করে ফেলা ছাড়া আর কিছু ভাবা এই মুহূর্তে মুশকিল। উদবৃত্ত মূল্যের আত্মসাৎ-এর বাসনা-যন্ত্রের অস্থায়ীকরণ প্রয়োজন, তার স্থায়ীকরণের বদলে। যেমন, কর্পোরেট পুঁজির শুরুর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেল লাইন পাতার উদ্দেশ্যে সামাজিকভাবে তৈরি করা হয়েছিল পুঁজির কার্টেল এবং কাজ মিটি গেলে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সামাজিক ব্যক্তিজীবনে জীবন্ত শ্রমের মতোই উদবৃত্ত মূল্যও থাকে। উদবৃত্ত মূল্যের আত্মসাৎ-এর বাসনা-যন্ত্রের ক্ষণস্থায়ীকরণের মধ্যে দিয়ে উদবৃত্ত মূল্যকে দৈনন্দিন জীবনযাপনের বাসনায় উন্মুক্ত রাখা যায়।

তফাৎ সহ)। সামাজিকবাদের জায়গা থেকে, বিপরীতে, শ্রমকে দেখা হয় সমাজবদ্ধ মানুষের দ্বারা প্রকৃতির শোষণ, এবং তাকে জানা হয় রাজনৈতিক-অর্থনীতির সম্পর্ক বরাবর। শ্রম বিষয়বত্তা পায় বিনিময়মূল্য হিসেবে, একটা সামাজিক ব্যবস্থায়, যেখানে ব্যক্তি অন্তর্হিত হয়।' (পৃ ১৩৩-৩৪)। এখানে শ্রমকে জীবন্ত শ্রম হিসেবে না ধরে শ্রমকরণ হওয়া শ্রমের কথা বলা হয়েছে, যা এরই মধ্যে অর্থনীতির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ফলতঃ শ্রমকে বিমূর্ত রূপে দেখা হচ্ছে, তাকে আর জীবন্ত শ্রম হিসেবে দেখা হচ্ছে না। জীবন যাপনের মধ্যে থেকে দেখা হচ্ছে না। বিমূর্ত শ্রম সামাজিক নয়।

৬

পুঁজিবাদ তার জন্মলগ্ন থেকে নিজের অন্তঃস্থলের অসমতার এবং বঞ্চনা যন্ত্রের কারণে একের পর এক সঙ্কটের জন্ম দিয়ে চলেছে। সেই সঙ্কট শুধু পুঁজিবাদের সঙ্কট হয়ে থাকেনি কখনোই, তা এক একটা মানবিক সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে মানুষ সহ এই পৃথিবীর সমস্ত জীবজগত-কে। যেন বা, মনুষ্যত্ব অক্ষুণ্ণ রাখাই মুশকিল। যেন বা, এত হাজার হাজার বছরের পাপ পূণ্যের, ঠিক ভুলের, ন্যায় অন্যায়ের পূর্বধারনাগুলি সব মিছে। খাওয়া পরা-র জন্য উপার্জনের বদলে আধুনিক শহুরে মানুষ যেন বা পরিণত হয়েছে উপার্জনের নিমিত্ত খাওয়া পরা এক একটি জোম্বি-তে। প্রেম ভালোবাসার জায়গা নিচ্ছে রোবোটিক যৌনতা। মেলামেশার জায়গা নিচ্ছে ইমেজ বা প্রতিকৃতি। করা-র জায়গা নিচ্ছে দেখানো। আয়ুর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মনোরোগ। এই অভূতপূর্ব করোনা পরিস্থিতি আমাদের পুঁজিবাদোত্তর পৃথিবীর দরজাটা খুলে দিয়েছে। সামাজিক এবং কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় আয়োজনে উত্তর-পুঁজিবাদী নানা ধরনের উদ্যোগের বাস্তবতাও তৈরি হচ্ছে। যেমন, অন্যের জন্য করা এবং অন্যের সাথে জিনিস ভাগ করে নেওয়া। সামাজিক মাধ্যমের গ্রুপ বা অ্যাপের মাধ্যমে অন্যের জরুরি প্রয়োজনে শ্রমদান করা সংগঠিতভাবে হতে পারে। করোনার লকডাউনের শুরুর দিনগুলিতে এরকমভাবে অনেকেই বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তিদের জরুরি পরিষেবা জুগিয়েছিলেন। এমনিতেই গ্রাম শহরে বহু মানুষ 'লোকের জন্য করে'। 'দরকারে ডাকলে পাওয়া যায়'। আগে এটা ছিল সামাজিক। মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের রাজনীতির অভাব পুষিয়ে দেবার জন্য এই ব্যাপারটার রাজনীতিকরণ করেছে। এখন পঞ্চায়েত মেম্বার পদের দাঁড়াবার জন্য বা কাউন্সিলর পদে দাঁড়াবার জন্য এইটা ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়াও আর্তের ত্রাণ ব্যাপারটিও সংগঠিত এনজিও উদ্যোগ ও রাজনৈতিক দলগুলির উদ্যোগের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে গেছে। এছাড়াও এইগুলোকে অনেকসময়ই তথাকথিত 'সোসাল ক্যাপিটাল' বা 'সামাজিক পুঁজি' তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন, কর্পোরেটদের ব্র্যান্ডভ্যালু বাড়ে তার 'কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি'র মাধ্যমে। এই উদ্দেশ্য প্রণোদনা থেকে বার করে এগুলিকে স্রেফ এগুলো-যা-শুধু-সেটাই — অর্থাৎ লোকের জন্য করা — এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ রাখার জন্যই একটি সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আয়োজন প্রয়োজন। আমাদের সমাজের পুরনো-দিনের-সুখ-স্মৃতি-তে এই স্রেফ বিনা লাভে অন্যের কাজ করে দেবার ব্যাপারটি রয়ে গেছে। তার পুনরাবৃত্তি

প্রয়োজন। একইভাবে, জিনিসপত্র শেয়ার করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এটাও রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক আয়োজনে সামাজিক মাধ্যম ও অ্যাপ ব্যবহার করে সংগঠিত করা যায়। এটাও যে নতুন কিছু তা মোটেই নয়। আগেও এসব হতেই থাকত। সামাজিক মাধ্যম বা অ্যাপের মাধ্যমে করা হলে যেটা হবে, এগুলো সংগঠিত হবে, কিন্তু সে সংগঠনের জন্য আলাদা করে কোন লোককে নিয়োজিত হতে হবে না। ফলতঃ কো-অর্ডিনেট করার যে সমস্যা — তা প্রযুক্তিগত হয়ে যাবার মধ্যে দিয়ে তাতে যে কোনো সংগঠিত উদ্যোগের সংগঠকদের মাতব্বরী বা সুফল আত্মসাৎ-এর (টাকা বা ক্ষমতার মাধ্যমে) যে অলঙ্ঘনীয় বাধার সম্মুখীন হতে হত, তা দূর হবে। এটা একটা উদাহরণ হিসেবে বলা হল। এরকম নানা উত্তর-পুঁজিবাদী সংগঠিত উদ্যোগের পরিস্থিতি বা বাস্তবতা তৈরি হচ্ছে। প্রতিটিতেই থাকবে নানা পুরনো প্রাকপুঁজিবাদী সম্পর্কের স্মৃতি-জনিত পুনরাবৃত্তি। সঙ্গে থাকবে এখনকার নানা অসংগঠিত এবং তথাকথিত অসফল সংগঠিত উদ্যোগ। অনুষঙ্গের কারণে সেই পুনরাবৃত্তি নতুন। আগের মতো নয়।

তবে করোনা পরিস্থিতি যেমন নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদোত্তর দুনিয়ায় পদার্পন-এর দরজা খুলে দিয়েছে, তেমনি পুঁজিবাদের কয়েকশ' বছর প্রতিটি সমাজের অভ্যন্তরে এবং এক সমাজ ও অন্য সমাজের মধ্যে অসমতা তৈরি করেছে। জীবনযাপনের সেই অসমতা এতটাই বেশি যে তা কখনও কখনও বিকৃতি স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সমাজের সমাজ হিসেবে চলার ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। এই অসমতা সমাজগুলির পুঁজিবাদোত্তর দুনিয়ায় পদার্পনের পক্ষে বাধা। জাত ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ ভাষা কোথায় থাকে কী করে ইত্যাদি সাপেক্ষে খাদ্য স্বাস্থ্য বাড়িঘর শিক্ষা ভ্রমণ খেলাধুলো পরিবেশ কাজকর্ম ইত্যাদি জীবনযাপনের নানা অঙ্গে মানুষে মানুষে বিস্তর ফারাক তৈরি করেছে পুঁজিবাদ। এই ফারাক দূর করার, এই অসমতা দূর করার নানা বন্দোবস্ত ছাড়া উত্তর-পুঁজিবাদী সংগঠিত উদ্যোগ অর্থহীন। অসমতা দূর করার বন্দোবস্তগুলি অতি অবশ্যই অর্থনীতির পুঁজিবাদী ইঞ্জিনের ওপর উল্টোমুখী সামাজিক বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই সম্ভব। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মাইনের বৈষম্য কমিয়ে সবচেয়ে কম ও বেশি মাইনের অনুপাত চার-পাঁচের মধ্যে আনা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চাকরি-ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাত-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ বিশেষে যারা পিছিয়ে আছে তাদের অতিরিক্ত সুবিধার বন্দোবস্ত করা, লভ্যাংশের ওপর চড়া হারে কর, ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। সমতার ইস্তাহার পুস্তিকায় এ

প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।[১২] বলাই বাহুল্য, এই উল্টোমুখী সামাজিক বলপ্রয়োগ অর্থনীতির মধ্যেই প্রযুক্ত হবে। এমনকি অর্থনীতিবিদরা-ও পুঁজি-বাদকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য এই ধরনের নিদান দিয়ে থাকেন আজকাল। কারণ অর্থনীতির পুঁজিবাদী ইঞ্জিন অর্থনীতিকে ইদানিং ধনতন্ত্র থেকে এক ধরনের ধনীতন্ত্র তথা সামন্ততন্ত্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলে তারা ভয় পাচ্ছেন। যাই হোক, অর্থাৎ, একইসাথে, অর্থনীতির ভেতরে সমতার লক্ষ্যে সামাজিক বলপ্রয়োগ করে তার গতিরুদ্ধ করা, এবং অর্থনীতির বাইরে উত্তর-পুঁজিবাদী সংগঠিত উদ্যোগ — এই দুয়ের যুগলবন্দী প্রয়োজন। একে অন্যের সম্পূরক।

পরিশেষ, যে করোনা তথা লকডাউন পরিস্থিতি নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল — সেই পরিস্থিতিতে কিছু কেজো কথা বলে ইতি টানা যাক। শ্রমদিবসের দৈর্ঘ্য কমানো দরকার এবং আমাদের দেশে এটা বলে কোনো লাভ নেই, কারণ আমাদের দেশ আপাততঃ পুঁজিপতিদের কথাতেই চলবে। শ্রমদিবস অন্য দেশগুলিতে কমলে তারপর আমাদের দেশে কমতে পারে। এই শ্রমদিবসের দৈর্ঘ্য কমানোর যে প্রস্তাব (আট ঘন্টা থেকে পাঁচ ছয় ঘন্টা করা) তা অর্থনীতিবিদদেরও প্রস্তাব হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে এই প্রস্তাব দেবার সাহস রাজন বা বিনায়ক বা অমর্ত্য-র নেই। এটা ইউরোপ আমেরিকা থেকে শুরু হবে হয়ত।

আমাদের ভাবনা কখনোই অর্থনীতির চিন্তার দিক থেকে হতে পারে না। আমাদের প্রস্তাব কখনোই অর্থনীতির ভালোর দিক ভেবে হতে পারে না। বরং আমাদের ভাবা উচিত ব্যক্তি শ্রমিক/বেকারের স্বার্থ। যে ব্যক্তি শ্রমিক/বেকার আমি নিজেও। ব্যক্তি শ্রমিক/বেকারের স্বার্থের চেয়ে পৃথক স্বার্থ আমাদের থাকা উচিত না। আমাদের মধ্যে যদি কেউ বারো ঘন্টা খেটে তাদের কাজ টিকিয়ে রাখতে চায়, বেশ কথা। আমাদের মধ্যে যদি কেউ বিদ্রোহ করে কাজের ঘন্টা কমাতে চায়, তা তো আরো ভালো। আমাদের মধ্যে যদি কেউ পেশা বদল করতে চায়, স্বাগত। এসব মিলেই আমরা। আমাদের ব্যক্তি শ্রমিক/বেকারের কার্যকলাপের দিকে মনোযোগ নিবিষ্ট করা প্রয়োজন। আমরা কীভাবে এই বিপদের মোলাকাৎ ও মোকাবিলা করছি, সেই অভিজ্ঞতাই তৈরি করবে করোনা-উত্তর আমাদের এখানকার উত্তর-পুঁজিবাদে পদার্পনের পন্থা।

[১২] https://archive.org/details/equity-manifesto-ebooklet